ইসলামী জিন্দেগী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরাতুল আল্লামা
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Reza Darul Ifta Society
S/1L/No 98985
WB

ইসলামী জিন্দেগী

Reza Darul Ifta Society
S/1L/No 98985
W B
No-66
Islamiya College Road, Murshidabad

মূলঃ হাকীমুল উম্মত
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

অনুবাদঃ অধ্যাপক লুৎফুর রহমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

✪ প্রকাশনায় ➠ আরিফুর রহমান নিশান
নিশান প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

✪ প্রকাশকাল ➠ ০১/০৮/৯৬ইং

পুর্ণঃ মুদ্রণ : ২২/০৫/২০০০
১২/১১/২০০৪
২০/০৫/২০০৯

হাদিয়া ➠ ৭৫.০০ টাকা

✪ কম্পোজ ➠ মাইক্রো কম্পিউটার
৫৭, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

✪ মুদ্রণে ➠ আনন প্রেস
চট্টগ্রাম।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
◗ মুসলমানদের অধঃপতনের কারণসমূহ ও ওসবেরর প্রতিকার	১
◗ শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত প্রথাসমূহ	৬
এসব প্রথাসমূহের কূফল	৬
ইসলামী নিয়ম সমূহ	৮
◗ আকীকা ও খত্না উপলক্ষে প্রচলিত প্রথাসমূহ	৯
এসব প্রথা সমূহের কূফল	১০
আকীকা ও খত্না'র ইসলামী নিয়ম	১১
◗ শিশুর লালন পালনের প্রচলিত প্রথাসমূহ	১৩
এসব প্রথাসমূহের কূফল	১৪
◗ শিশু লালন পালনের ইসলামী নিয়ম	১৫
◗ বিবাহ-শাদীর প্রথা সমূহ	১৮
পাত্রী পছন্দ, তারিখ নির্ধারণ ও মেহেদী অনুষ্ঠান	১৮
এসব প্রথাসমূহের কূফল	১৯
ইসলামী নিয়ম সমূহ	২১
বিবাহ ও বধু বিদায়ের প্রথাসমূহ	২৩
বিবাহ-শাদীর ইসলামী নিয়ম সমূহ	৩০
যৌতুক	৩২
◗ হযরত ফাতিমাতুয যোহরার শাদীয়ে মুবারক	৩৪
বিবাহের পরবর্তী প্রথাসমূহ	৩৮
◗ মুহররম, শবে বরাত, ঈদ ও কুরবানীর কূপ্রথা সমূহ	৪২
এসব প্রথা সমূহের কূফল	৪৪
উপরোক্ত দিন গুলোতে পালনীয় ইসলামী রীতি সমূহ	৪৬
◗ আধুনিক ফ্যাশন ও পর্দা	৪৯
আধুনিক ফ্যাশনের কূফল	৫০
কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন	৫৪
ইসলামী বেশ ভূষা	৬০
মহিলাদের পর্দা	৬২
নারী শিক্ষা	৭০
অপছন্দনীয় প্রথা সমূহ	৭১
মৃত্যুর সময় ইসলামী প্রথা সমূহ	৭৩
মৃত্যুর পরবর্তী ইসলামী প্রথা সমূহ	৭৬
◗ দৈনন্দিন জীবনে উপকারী অজীফা ও আমল সমূহ	৭৮
বার মাসের বরকতময় দিন সমূহের অজীফা ও আমল সমূহ	৮১
◗ মুসলমান ও বেকারত্ব	৮৪
হালাল উপার্জনের ফযীলত সমূহ	৮৫
নবীগণ কি কি পেশা অবলম্বন করেছিলেন	৮৯
ব্যবসার মুলনীতি	৯৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকের কথা

*কালের বিবর্তনে নানা কূপ্রথার সংমিশ্রনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী জিন্দেগী আজ কলুষিত। জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে এমন সব কূপ্রথার প্রচলন হয়েছে, যেগুলো ইসলামের সেই শ্বাশত সৌন্দর্যকে একেবারে মলীন করে দিয়েছে। অনেক মুসলিম পরিবার এসব কূপ্রথার কারণে দৈউলিয়া হয়ে গেছে এবং এখনও অহরহ হতেই আছে। মুসলমানদেরকে এ অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার একান্ত বাসনা নিয়ে হাকীমুল উম্মত মূফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) ছাহেব **'ইসলামী জিন্দেগী'** নামে উর্দু ভাষায় একখানা কিতাব রচনা করেন, যা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং লেখকের পরিশ্রম অনেকটা স্বার্থক হয়। বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোন বই না থাকায় আমি বইটির অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করি। আশা করি, আমাদের বাঙ্গালী সমাজকেও বইটি সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে।*

জনাব নঈমী সাহেব জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথমে প্রচলিত কূপ্রথাগুলোর বিবেরণ দিয়েছেন, অতপর এসবের কূফল বর্ণনা করেছেন, এরপর ইসলামী রীতিনীতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। কিতাবটি খুবই সহজ ভাষায় প্রণিত হয়েছে, যেন সকল পাঠক উপকৃত হতে পারেন। এ ধরনের বই এর বহুল প্রচার ও প্রসার হওয়া একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে সুধী পাঠক মহলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ সমূহ ও ওসবের প্রতিকার

আজকের মুসলমানদের অধঃপতন, অপদস্ত ও করুণদশার জন্য এমন কেউ নেই, যে অনুশোচনা করে না বা ওদের অভাব অনটন, বেকারত্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে না। রাজত্ব ওদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, ইজ্জত-সম্মান, পদমর্যাদা সব হারিয়েছে, যুগের সব মসীবতের শিকার মুসলমানেরাই হয়েছে। এ অবস্থাদৃষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুগণ! শুধু হা-হুতাস ও কান্নাকাটি করলে কোন কাজ হবে না। বরং এর প্রতিকারের জন্য স্বয়ং মুসলিম জাতির এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ রোগের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি বিষয় চিন্তা করা দরকার।

একেতঃ মূল রোগটা কি? দ্বিতীয়তঃ এ রোগের কারণ কি ? এ রোগ কেন সৃষ্টি হলো? তৃতীয়তঃ এর চিকিৎসা ও প্রতিকার কি? চতুর্থতঃ এ চিকিৎসায় কি কি জিনিস নিষিদ্ধ? এ চারটি বিষয় যদি ভালমতে জেনে নেয়া যায়, তাহলে চিকিৎসা অতি সহজ হবে।

জাতির নেতৃবর্গ এবং দেশের কর্ণধারেরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, সম্পদের অভাবই মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ। সম্পদ অর্জন করতে পারলে উন্নতি হয়ে যাবে। কেউ বলেছেন, সংসদের মেম্বার হয়ে ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি করতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার কেউ বলেছেন, সমস্ত রোগের চিকিৎসা হচ্ছে কোদাল। কোদাল হাতে নাও, কেল্লা ফতেহ হয়ে যাবে। এসব পন্ডিতগণ এ নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈ চৈ করলো কিন্তু রোগ বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন লাভ হলো না। ওদের উদাহরণ সেই মূর্খ মায়ের মত, যার শিশু পেটের ব্যথায় কান্না করে আর সে ওকে শান্ত করার জন্য মুখে দুধ দেয়। যার ফলে শিশু কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে যায় বটে। কিন্তু রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। কেননা প্রয়োজন ছিল যে জোলাপ দিয়ে শিশুর পেট পরিষ্কার করা। তা না করে দুধ খাওয়ায়ে আরও ক্ষতি করলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ আজ পর্যন্ত কোন নেতা মূল রোগ নির্ণয় করতে পারেনি এবং সঠিক চিকিৎসাও বাত্লাতে পারেনি। যার ফলে মুসলিম জাতির এমন অধঃপতন হয়েছে যে, যে সব আল্লাহর বান্দা সঠিক চিকিৎসার কথা বলেছেন, মুসলিম জাতি ওদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। অনেকে ওদেরকে গালমন্দ করেছে। মোট কথা, সঠিক ডাক্তারগণের আহবানে কেউ সাড়া দেয়নি। আমি এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করার আগে একটি কাহিনী বলছিঃ

এক বুড়ো এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব, আমার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন, বার্ধক্যের কারণে। বুড়ো বললো, কোমরে ব্যথাও লাগে। ডাক্তার বললেন, বার্ধক্যের কারণে। বুড়ো বললো, চলাফেরা করলে শ্বাস-প্রশ্বাসও বেড়ে যায়। ডাক্তার বললেন, তাও বার্ধক্যের কারণ। বুড়ো বললো, স্মরণশক্তিও কমে গেছে, কোন কথা স্মরণ থাকে না। ডাক্তার বললেন, এটাও বার্ধক্যের কারণ। বারবার বার্ধক্যের কথা বলায় বুড়ো খুবই রাগান্বিত হলো এবং রাগের মাথায় বললো, আরে বোকা ডাক্তার, তুমি চিকিৎসা বিদ্যায় বার্ধক্য ছাড়া আর কিছু পড়োনি। ডাক্তার বললেন, বুড়ো মিয়া, আমার উপর যে বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে আপনার রাগ এসে গেল, এটাও বার্ধক্যের কারণে।

আজ আমাদের অবস্থাও তাই হয়েছে। মুসলমানদের রাজত্ব গেল, ইজ্জত গেল, সম্পদ গেল, পদমর্যাদা গেল, মোট কথা সব কিছু গেল একমাত্র একটি কারণে। সেটা হলো আমরা শরীয়তে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের জিন্দেগী ইসলামী রইলো না, আমাদের মনে আল্লাহতাআলার ভয়, নবীর সম্মান, পরকালের ভীতি কিছুই রইলো না। এসব অধঃপতনের একমাত্র কারণ শরীয়তের প্রতি উদাসীনতা। আলা হযরত ঠিকই বলেছেন-

دن لهو مین کهونا تجهے شب نیند بهر سونا تجهے

شرم نبی خوف خدایه بهی نهین وبهی نهین

অর্থাৎ সারা দিন বাজে কাজে এবং সারা রাত ঘুমে কাটাচ্ছে। নবীর প্রতি লজ্জাবোধ ও আল্লাহর ভয় কোনটা নেই।

আমাদের মসজিদসমূহ জনশূন্য কিন্তু সিনেমা হলসমূহ মুসলমানদের দ্বারা ভরপুর। সব রকমের কুকর্ম মুসলমানদের মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়েছে। হিন্দুয়ানী প্রথা

আমাদের মধ্যে চালু হয়েছে। তাই আমরা কিভাবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি? উর্দু কবি মুহাম্মদ আলী জাওহার খুবই সুন্দর বলেছেন-

بلبل وگل گئے گئے لیکن

هم کو غم هے چمن کے جانے کا!

অর্থাৎ বাগানে কোন ফুলও নেই এবং বুলবুল পাখীও নেই। আমার ভয় হচ্ছে, শেষ পথ কি বাগানটাও বিলীন হয়ে যাবে।

পার্থিব সমস্ত উন্নতি বুলবুল পাখী সদৃশ এবং দ্বীন হচ্ছে ফুলের বাগান বিশেষ। যদি বাগান আবাদ থাকে, তাহলে হাজার হাজার বুলবুল পাখী আবার আসবে কিন্তু যখন বাগান উচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন বুলবুল পাখীর আগমনের আর আশা থাকে না। শরীয়তে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ত্যাগ করাটাই হচ্ছে মুসলমানদের মূল রোগ। এখন এর কারণে আরও অনেক রোগের সৃষ্টি হয়েছে। এসব রোগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-এক, দৈনন্দিন নিত্যনতুন ফেরকার জন্ম এবং প্রত্যেকের আহবানে চোখ বন্ধ করে সাড়া দেয়া। দুই, মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, পরস্পর শত্রুতা ও মামলা-মোকদ্দমা। তিন, আমাদের মুর্খ বাপ-দাদাদের আবিষ্কৃত শরীয়ত বিরোধী কুপ্রথাসমূহ। এ তিন প্রকারের রোগ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, নিজেদের ভিটেবাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে, ঋণগ্রস্থ করে দিয়েছে। মোট কথা জিল্লতীর চরম পর্যায়ে পৌছায়ে দিয়েছে।

প্রথম প্রকারের রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো-মুসলমানগণ একটি বিষয় যেন খুব ভাল করে স্মরণ রাখে। সেটা হচ্ছে, কাপড় নতুন পরিধান করুন, ঘর নতুন তৈরী করুন, নতুন নতুন খাবার গ্রহণ করুন, প্রতিটি পার্থিব কাজ নিত্যনতুনভাবে করুন। কিন্তু দীন সেই চৌদ্দশ' বছরের পুরানোটা গ্রহণ করুন। আমাদের নবী পুরাতন, দীন পুরাতন, কুরআন, কাবা পুরাতন, খোদাতাআলা পুরাতন (কদীম)। আমরা সেই পুরাতনের অনুসারী। পীরে তরীকত হযরত সায়্যেদ জামাআত আলী শাহ সাহেব মরহুম মগফুর প্রায় সময় উপরোক্ত কথাগুলো বলতেন। সকল বদমযহাবের সংশ্রব থেকে বিরত থাকুন। ওই ধরনের মাওলানা-মওলভীদের কাছে বসুন, যাদের কাছে বসার দ্বারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইশ্ক এবং শরীয়তের অনুসরণের জজবা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় প্রকারের রোগের চিকিৎসা হলো-প্রায় ফিৎনা-ফ্যাসাদের মুলে দু'টি জিনিস রয়েছে-একটি রাগ ও আত্মগৌরব, অপরটি শরীয়তের কর্তব্যসমূহ থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদাসীন। প্রত্যেক ব্যক্তি কামনা করে আমি যেন সবার থেকে উর্ধে হই, সবাই যেন আমার হকসমূহ আদায় করে কিন্তু আমি যেন কারো হক আদায় না করি। যদি আমাদের মন থেকে আমিত্ব বের হয়ে যায়, বিনয়ী মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে একে অপরের হকের কথা স্মরণ রাখি, তাহলে ইন্‌শা আল্লাহ, কখনো যুদ্ধ বিগ্রহ, মামলা-মোকদ্দমা কিছুই থাকবে না। অধমের এ সামান্য আলোচনা ইনশা আল্লাহ, অনেক ফায়দা দেবে, যদি এ মতে আমল করা হয়।

তৃতীয় প্রকারের রোগ সমূহের চিকিৎসার জন্যই এ কিতাব লিখা হয়েছে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন উপলক্ষে এমন ধ্বংসাত্মক প্রথাসমূহ প্রচলিত হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের মূল ভিতকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমি স্বয়ং দেখেছি যে জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শাদীর এসব কুপ্রথাসমূহের ফলে হাজার হাজার মুসলমানদের ভূ-সম্পত্তি, ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুদী ঋণের কারণে হিন্দুদের হাতে চলে গেছে। অনেক উচ্চ বংশের লোক আজ ভিটাবাড়ী হারিয়ে ভাড়া ঘরে বসবাস করছে এবং পদে পদে হুমড়ি খেয়ে জীবন ধারণ করছে। এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাপের চেহলামের রুটি দেয়ার জন্য এক হিন্দু থেকে চারশ টাকা সুদী কর্জ নিয়েছিলেন, যার জন্য ২৭০০ টাকা দিয়ে দিয়েছেন এবং আরও ১৫০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। জায়গা জমি প্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। তিনি এখনও জীবিত আছেন। ছেলেপিলে নিয়ে খুবই অভাব অনটনের মধ্যে জিন্দেগী যাপন করছেন।

স্বজাতির এহেন অবস্থা দেখে মন খুবই ভারাক্রান্ত হলো। ইচ্ছে হলো দু'এক কলম লিখে জাতির কিছু খেদমত করি। কালির ফোঁটাকে আমার চোখের পানির ফোটা হিসেবে ধরে নিতে পারেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, এ পুস্তিকা দ্বারা যেন জাতির পরিশুদ্ধি হয়। আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে অনেক লোক বিবাহ শাদীর কু প্রথা, যৌতুক ইত্যাদির ব্যাপারে নারাজ। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সমালোচনা ও স্বীয় নাক কাটা যাবার ভয়ে যেভাবে হোক ধার কর্জ করে সেই কুপ্রথাগুলোর চাহিদা পূর্ণ করে। এ রকম কোন মর্দে মুমিন দেখা যায় না, যিনি নির্ভয়ে প্রত্যেকের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত কুপ্রথার উপর পদাঘাত করে এবং সুন্নাতকে জীবিত করে জাতিকে দেখিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি কোন সুন্নাতকে জীবিত করে, সে শত শহীদের ছওয়াব লাভ করে। কেননা শহীদতো

একবারই তলোয়ারের বা আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে মারা যায়। কিন্তু এ আল্লাহর বান্দা সারাজীবন লোকের মুখের আঘাত খেতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত প্রথাসমূহ দু'প্রকারের-প্রথম প্রকারের প্রথা সমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয, দ্বিতীয় প্রকারের প্রথাসমূহ ধ্বংসাত্মক। এগুলো পালন করতে গিয়ে অনেক মুসলমানকে সুদের আশ্রয় নিতে হয় অর্থাৎ সুদী কর্জ নিতে হয়। অথচ ইসলামে সুদ দেয়া-নেয়া উভয়টা হারাম। তাই এ প্রথাসমূহ হারাম কাজের উৎসও বটে। এ পুস্তিকায় উভয় প্রকারের প্রথাসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পাঠকগণের সুবিধার্থে এ পুস্তিকাকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন জন্ম সংক্রান্ত প্রথা সমূহের অধ্যায়, বিবাহ শাদীর প্রথা সমূহের অধ্যায়, মৃত্যু সংক্রান্ত প্রথা সমূহের অধ্যায় ইত্যাদি। প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে - (১) প্রচলিত প্রথাসমূহ (২) এর ক্ষতিকর দিকগুলো এবং (৩) বৈধ ও সুন্নতসম্মত নিয়মাবলী।

এ পুস্তিকার নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামী জিন্দেগী'। আল্লাহতাআলা যেন তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সদ্‌কায় এ নামকরণটা যথার্থ করেন ও কবুল করে মুসলমানদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন এবং একে আমার জন্য পরকালের সম্বল ও সদ্‌কায়ে জারিয়ায় পরিণত করেন। আমীন

يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بِجَاهِ رَسُوْلِكَ الرَّؤُفِ الرَّحِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

- অধম আহমদ ইয়ার খান নঈমী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম অধ্যায়

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত প্রথা সমূহ

শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম প্রথাসমূহের প্রচলন আছে। তবে কতেক প্রথা কিছু তারতম্য সহকারে প্রায় জায়গায় দেখা যায়। এরকম কয়েকটি প্রথার কথা নিম্নে উল্লেখিত হলোঃ

(১) পুত্র সন্তান জন্ম হলে সাধারণতঃ অধিক আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং কন্যা সন্তান জন্ম হলে অনেকে খুশীর পরিবর্তে দুঃখবোধ করে।

(২) প্রথম সন্তানের বেলায় অধিক আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সন্তানগুলোর বেলায় কম আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

(৩) শিশুর জন্মদিন নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

(৪) পুত্র সন্তান জন্ম হলে মহিলারা একত্রিত হয়ে ছয়দিন পর্যন্ত ঢোল বাজায়।

(৫) শিশুর জন্মের দিন পারিবারিক ডোমেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান গেয়ে ঘরের চারিদিক ঘিরে ফেলে এবং বখ্‌শীশ প্রার্থনা করে। অতঃপর মনঃপুত বখ্‌শীশ আদায় করে চলে যায়।

(৬) বোন, বোনের জামাই ও অন্যান্যদেরকে জোড়া কাপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি অনেক কিছু বিভিন্ন প্রথার প্রেক্ষিতে দিতে হয়।

(৭) বধুর মা-বাপ বা ভাই এর পক্ষ থেকে উপঢৌকন আসাটা অপরিহার্য। এ উপঢৌকনের মধ্যে নবজাত শিশুর জন্য কাপড় চোপড়, বালিশ কাঁথা, দোলনা, বিছানাপত্র এবং বর-কনে, শ্বাশুর-শ্বাশুরী, ননদ-জা এমনকি ভাইপো, ভাই-ঝি'র জন্যও কাপড় দিতে হয়। কন্যা সন্তান হলে স্বর্ণালঙ্কারও দিতে হয়। মোট কথা এসব দিতে গিয়ে কন্যাপক্ষ হিমসিম খেয়ে যায়।

(৮) মালি ও চাকরানী ঘরের দরজায় বিভিন্ন পাতা বা কাগজের ফুল বেঁধে দেয় এবং এর বিনিময়ে এক জোড়া কাপড় বা টাকা পয়সা আদায় করে।

এসব প্রথাসমূহের কুফল

কন্যা সন্তান জন্ম হলে দুঃখ প্রকাশ করাটা কাফিরদের স্বভাব। যেমন

আল্লাহতাআলা কুরআন করীমে ফরমায়েছেনঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

(ওদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন ওর মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোঃকষ্টে ভোগে ১৬-৫৮)।

কিন্তু আসলে যে মহিলার প্রথমবার কন্যা সন্তান হয়, সে আল্লাহতাআলার ফজলে সৌভাগ্যবতী। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরে প্রথমে কন্যা সন্তানই জন্ম হয়েছিল। এটা আমাদের নবীর সুন্নাত।

যুবতী মহিলাদের গান বাজনা হারাম। মহিলাদের আওয়াজও পরপুরুষের কানে না পৌছা চাই। নামাযরত কোন মহিলার সামনে দিয়ে কেউ গেলে, মহিলা পুরুষের মত 'সুবহানাল্লাহ' বলে আওয়াজ করে বাঁধা দিতে পারে না বরং তালি দিয়ে অবহিত করতে হয়। যখন আওয়াজের ব্যাপারে এ বাধ্যবাধকতা, তখন প্রচলিত গান বাজনা সম্পর্কে কি আর বলা যেতে পারে।

শিশু জন্মের আনন্দে নফল নামায পড়া, দান খয়রাত করা ছওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রতিবেশীর সমালোচনা বা নাক কেটে যাওয়ার ভয়ে মিষ্টি বন্টন করা একেবারে অনর্থক। আর যদি সুদী কর্জ নিয়ে এ কাজ করা হয়, তাহলে পরকালেও গুনাহের ভাগী হলো। তাই এসব প্রথা বন্ধ করে দেয়া উচিত। পারিবারিক ডোম ও নাপিতকে এ উপলক্ষে কিছু দেয়া কখনও জায়েয নয়। ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোটা ওদেরকে গুনাহের প্রতি উৎসাহ দেয়ার সামিল। যদি ওসব উপলক্ষে ওরা কিছু না পায়, তাহলে তারা সেই হারাম পেশা ত্যাগ করে হালাল উপার্জনে আগ্রহী হবে। আমার আশ্চর্য লাগে যে-এসব পারিবারিক ডোম-নাপিত কেবল মুসলমানদের মধ্যে আছে, ইহুদী-নাছারা, হিন্দু-শিখ, পারসিক জাতির মধ্যে এসব লোক নেই। এর কারণ হলো মুসলমানদের মধ্যে কুপ্রথা বেশী এবং এসব কুপ্রথার কারণেই এসব লোক মুসলমান দ্বারা পালিত হচ্ছে। অন্যান্য জাতিতে এসব কুপ্রথাও নেই এবং এরকম লোকও নেই। এটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের কপালে কাল দাগ সদৃশ। আল্লাহতাআলা এসব লোকদেরকে হালাল রুজি উপার্জনের তৌফিক দান করুক।

বোন, বোনের জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা ও সাহায্য করা নিঃসন্দেহে ছওয়াবের কাজ, যদি এর দ্বারা আল্লাহ ও রসুলকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যদি পার্থিব সুনাম ও লোক দেখানোর জন্য এসব করা হয়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে অর্থহীন। লোক দেখানো নামায পড়াও অর্থহীন। আসলে ওসব ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করা হয় না। কেবল কুপ্রথার কারণে ও লোক দেখানোর জন্য এসব কিছু করা হয়ে থাকে। তা নাহলে উপঢৌকন আনার সময় গান বাজনায় চারিদিক মুখরিত করার কি প্রয়োজন আছে। ধনীরাতো এসব খরচ সহ্য করে নেয় কিন্তু গরীব মুসলমানেরা এসব কুপ্রথা পূর্ণ করার জন্য হয়তো সুদী কর্জ নেয় অথবা ঘরবাড়ী বন্ধক দেয়। সুতরাং এসব কুপ্রথা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। রসুলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ মোতাবেক নিজের মেয়ে বা বোনকে বিভিন্ন উপলক্ষে যা খুশী তা দিতে পারেন। কিন্তু এ কু প্রথাগুলোকে নির্মূল করুন। কফ-কাঁশি প্রতিরোধ করুন যেন জ্বর আসা বন্ধ হয়। আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে যে, শিশুর জন্মের পর বধুর বাপের বাড়ী থেকে এসব প্রথাসমূহ মতে যদি সবকিছু প্রদান করা না হয়, তাহলে শ্বাশুরী-ননদের তিরস্কারে বধুর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং পারিবারিক কলহ শুরু হয়ে যায়। যদি এসব কু প্রথাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ওসব কলহ-বিবাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইসলামী নিয়মসমূহ

শিশুর জন্মের পর যেসব কাজ ইসলাম সম্মত, তা হচ্ছে, জন্ম হওয়া মাত্রই যেন নাভী কাটা হয়, গোসল দেয়া হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওর ডান কানে আযান এবং বাম কানে যেন তকবীর বলা হয়। ঘরের যে কোন ব্যক্তিই আযান তকবীর বলতে পারে বা এজন্য মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে ডেকে আনা যায় এবং আযান ও তকবীর বলার জন্য খয়রাত ও সদকার নিয়তে ওনাদেরকে টাকা-পয়সা কিছু দিলে ভাল। কেননা এর দ্বারা আল্লাহতাআলার শুকরিয়া আদায় হয়। অতঃপর এটা চেষ্টা করা দরকার যে কোন নেক-বান্দার হাতে যেন শিশুর প্রথম খাদ্য দেয়া হয়। তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে শিশুর মধ্যে প্রথম খাদ্য প্রদানকারীর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং ওনার মত স্বভাব-চরিত্র গঠন হয়। সুন্নাত হচ্ছে কোন নেক বান্দা কর্তৃক খোরমা বা খেজুর চিবায়ে শিশুর পেটে যেন সর্বপ্রথম খাদ্য হিসেবে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের নবজাতকের বেলায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা এ রকম করাতেন। ধাত্রীর জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া চায়, যেটা কাজের পর যেন দিয়ে দেয়া হয়। সন্তান হওয়ার আনন্দে যদি মিলাদ শরীফ বা বুর্জগানে কিরামের নামে ফাতিহা দেয়া হয়, তাহলে খুবই ভাল। এ কয়েকটি কাজ ছাড়া বাদ বাকী সব প্রথাসমূহ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিশেষ করে উপঢৌকনের প্রথাটা একেবারে বিলুপ্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

আকীকা ও খত্না উপলক্ষে প্রচলিত প্রথাসমূহ

সাধারণতঃ আকীকা ও খত্নার সময় নিম্নের প্রথাগুলো পালিত হয়ঃ

অনেক জায়গায় আকীকা করে না বরং ছট্ঠী করে থাকে। ছট্ঠী হচ্ছে শিশুর জন্মের ছয়দিন পর রাত্রে মেয়েরা একত্রিত হয়ে গান-বাজনা করে। অতঃপর নবজাতক শিশুকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে আকাশের তারা দেখায়ে গান করে। এরপর উপস্থিত সকলকে জর্দা-পোলাও পরিবেশন করে। গান অনর্থক গাওয়া হয়। এটা নির্ভেজাল হিন্দুয়ানী প্রথা।

আর যারা আকীকা করে, তারা সামাজিকতার খাতিরে পশু জবেহ করে। আমি স্বয়ং দেখেছি যে বড় সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা ৬/৭টি পশু জবেহ করে সমস্ত মাংস সমাজের মধ্যে বন্টন করে দেয়। কোন কোন সময় খানা পাকায়ে সবাইকে দাওয়াত দেয়। এটা বহুল প্রচলিত যে প্রথম সন্তানের জন্ম যদি বধুর পিত্রালয়ে হয়, তাহলে আকীকা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ বধুর মা-বাপকে বহন করতে হয়। বহন না করলে খুবই বদনামীর ভাগী হতে হয়।

খত্নার সময়ও এরকম বিভিন্ন কু প্রথা পালিত হয়। খত্নার আগের রাত জেগে থাকতে হয়, যাকে এসব প্রথা পালনকারীরা খোদায়ী রাত বলে। সেই রাতে সব মহিলারা একত্রিত হয়ে সারা রাত গান বাজনা করে এবং গৃহকর্তা এক প্রকার মিটাই তৈরী করে। ফজরের সময় যুবতী ও অন্যান্য মহিলারা গান গেয়ে মসজিদে যায় এবং কিছু মিটাই, কিছু পয়সা মসজিদের তাকে রেখে গান গেয়ে ফিরে আসে। এ প্রথাটা অনেক জায়গায় বিবাহের সময়ও পালন করে থাকে। তবে খত্নার সময় এ কুপ্রথা পালন করাটা একান্ত প্রয়োজন মনে করে থাকে। ভারতের ইউপিতে এর প্রচলনটা খুবই ব্যাপক।

খত্নার সময় আত্মীয় স্বজন সবাই একত্রিত হয়। সবার উপস্থিতিতে হাজাম খত্নার কাজ সমাধা করে স্বীয় পাত্র সবার সামনে রাখে। সবাই সেখানে টাকা ফেলে। ধনী গরীব হিসেবে এ টাকার পরিমাণ কমবেশী হয়ে থাকে। এরপর ছেলের পিতার পক্ষ থেকে সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রচলিত প্রথা অনুসারে ছেলের পিতা বোন, বোনাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে কাপড় দিয়ে থাকে। ছেলের নানা-নানী বা মামা মামীর পক্ষ থেকে তো নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় অবশ্যই পাঠাতে হয়। নিকট আত্মীয়েরা হাজামের পাত্রে যে টাকা পয়সা দেয়, সেটাকে 'মাইন' বলা হয়। এটা আসলে ছেলের পিতার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য কর্জের মত হয়ে থাকে। ওদের ঘরে যখন খত্না হয়, তখন একে সেভাবে টাকা দিতে হয়।

অনেক জায়গায় মঞ্চ তৈরী করে ছেলেকে বরের মত বসায়ে রাখে এবং মঞ্চের এক পাশে একটি পাত্র রাখে। আত্মীয় স্বজনরা সেটায় টাকা পয়সা ইত্যাদি অর্পন করে। এটাও এক প্রকার কর্জের মত।

এ সব প্রথা সমূহের কুফল

ছট্টী নির্ভেজাল হিন্দুয়ামী প্রথা, যেটা হিন্দুরা আকীকার মুকাবিলায় চালু করেছে। আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে মাহিলাদের গান-বাজনা হারাম। নবজাত শিশুকে তারা দেখানোও নিছক বাজে কাজ। আর গায়িকাদেরকে জর্দা পোলাও খাওয়ানোটা হচ্ছে হারাম কাজের বিনিময় দেয়ার মত। তাই এ ছটটীর প্রথাটা একেবারে বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন।

আকীদা ও খত্নায় উল্লেখিত অপব্যয়ের পরিণাম এটাই হবে যে লোকেরা খরচের ভয়ে সুন্নাতই ত্যাগ করবে। আকীকা ও খত্না করা সুন্নাত এবং সুন্নাত ইবাদত বিশেষ। ইবাদত সেইভাবে করতে হয়, যেভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে। নিজেদের পক্ষ থেকে নানাপ্রথা সংমিশ্রণ করা বাতুলতা মাত্র। নামায পড়া, যাকাত দেয়া ও হজ্ব করা ইবাদত। এখন যদি কেউ গান গেয়ে বাদ্য বাজিয়ে নামায পড়তে যায় বা যাকাত প্রদানের সময় খানাপিনার ব্যবস্থা করাটা প্রয়োজন মনে করে, তাহলে সেটাকে পাপাচার ছাড়া কি আর বলা যেতে পারে।

• আমি এক যুবকের মুখে শুনেছি যে ওর খত্না করা হয়নি। আমি ওকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বল্লো যে সমাজকে খাওয়ানোর মত টাকা পয়সা ওর বাপের কাছে ছিলনা। এ জন্য ওর খত্না হয়নি। দেখলেন, ওসব প্রথার কুফল। শিশুর লালন পালন ইত্যাদি যাবতীয় খরচের জিম্মাদার হচ্ছে শিশুর পিতা, শিশুর আকীকা ও খত্নার দায়িত্ব পিতার। কিন্তু প্রথম সন্তানের খত্নার ব্যয়ভার নানা মামাকে বহন করতে হয় মনে করাটা ইসলামী কানুনের বিপরীত। অনুরূপ বাধ্যতামূলক সামাজিক খানাপিনার আয়োজন ও হাজামকে উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে বখ্শীশ দেয়ার প্রচলন মারাত্মক কূপ্রথা। এটা প্রতিরোধ করা উচিত। 'মাইন' আদান প্রদানটাও খুবই খারাপ প্রথা, যা সম্ভবতঃ আমরা ভিন জাতি থেকে শিখেছি। এ কুপ্রথার কারণে অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। মনে করুন আমি কোন আত্মীয়ের চার অনুষ্ঠানে একশ' টাকা করে চারশ' টাকা দিলাম। এটা আমারও জানা আছে এবং ওনারও জানা আছে। এবার আমার ঘরে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওনাকে দাওয়াত দিলাম এবং মনে মনে ধারণা করলাম যে, উনি কমপক্ষে পাঁচশ' টাকা দিবেন। এতে চারশ' টাকা আদায় হয়ে যাবে

এবং বাড়তি একশ' টাকা আমার জিম্মায় থাকবে। এ দিকে ওনি স্থির করলেন যে, ওনার কাছে টাকা থাকলে দাওয়াত খেতে যাবেন, অন্যথায় যাবেন না। এখন যদি ওনার কাছে টাকা না থাকায় লজ্জার কারনে না যায় বা গিয়ে ২০/৫০ টাকা প্রদান করেন, তাহলে অপবাদ থেকে কোন অবস্থায় রেহাই নেই। ফলে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে। অনেকে কর্জ নিয়ে উপহার প্রদান করে। বলুন, এটা কি আনন্দ, নাকি দ্বন্দ্বের সূচনা। কেউ কেউ বলে যে, এ প্রথাটা অনুষ্ঠান আয়োজনকারীর জন্য কিছুটা সহায়ক। তাই ওদের মতে এ প্রথাটা ভাল। কিন্তু বন্ধুগণ, সহায়ক হয় বটে কিন্তু মনটা কেমন যে খারাপ হয়ে যায়। কারণ অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিতে হয়। পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করা ভাল কাজ। কিন্তু এটাতো পরস্পর সাহায্য নয়। যদি সাহায্য হতো, তাহলে পরে বদ্লা পাবার আশা কেন? সুতরাং এ প্রথা একেবারে বন্ধ হওয়া চাই। তবে নিকট আত্মীয়কে সাহায্য হিসেবে যদি দেয়া হয় এবং এর বদলা পাওয়ার কোন ধারণা পোষন না করে, তাহলে সেটা বাস্তবিকই সাহায্য। এতে কোন ক্ষতি নেই। সাহায্য সহযোগিতা দ্বারা আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু কর্জ দ্বারা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপহারটা এক প্রকার বেহুদা কর্জ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আকীকা, খত্না, বিবাহ, মৃত্যু সব ক্ষেত্রে এ উপহার প্রথাটা চালু আছে। একে একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত।

আকীকা ও খত্নার ইসলামী নিয়ম

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা হচ্ছে সুন্নাত তরীকা। যদি সপ্তম দিনে পারা না যায়, তাহলে ১৫তম দিনে বা একুশতম দিনে করা যায়। আকীকার নিয়ম হচ্ছে পুত্র সন্তানের পক্ষে এক বছর বয়সী দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষে এক বছর বয়সী একটি ছাগল যেন জবেহ করা হয়। আকীকার পশুর মাথা মুসলমান নাপিত বা হাজামকে এবং রান মুসলিম ধাত্রীকে দেয়া যায়। মাংসকে তিন ভাগ করে এক ভাগ ফকীর-মিসকীনকে, একভাগ প্রতিবেশীকে এবং এক ভাগ যেন ঘরে রাখা হয়। আকীকার পশুর হাড্ডিসমূহ না ভাঙ্গাটা ভাল। বরং পারলে গিরাসমূহ থেকে যেন আলাদা করে দেয়া হয় এবং মাংস ইত্যাদি খাওয়ার পর হাড্ডিগুলো যেন মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। সপ্তম দিন শিশুর নামও রাখা যেতে পারে। মুহাম্মদ নামটা হচ্ছে সবচে' উত্তম নাম। তবে যার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়, সেটাকে যেন বিকৃত করে ডাকা না হয়। আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান এবং নবীগণের ও সাহাবায়ে কিরামের নামানুসারে নাম রাখাটা ভাল। যেমন মূসা, ইব্রাহীম, ইসমাইল, আব্বাস, ইদ্যাদি। অর্থবিহীন নাম রাখাটা, অনুচিত, যেমন বদ্দু, জুমরাতী, খয়রাতী ইত্যাদি। অনুরূপ যেসব নামে গর্ব প্রকাশ পায়, সেসব নামও না রাখা চায়। যেমন শাহ জাহান, নওয়াব, রাজা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদশা ইত্যাদি এবং মেয়েদের বেলায় কমরুন নিসা, জাহান আরা বেগম ইত্যাদি। মেয়েদের নাম, ফাতিমা, আমিনা, আয়েশা, মরিয়ম, যয়নব, কুলছুম ইত্যাদি রাখা ভাল। আকীকার দিন যখন পশু জবেহ করা হয়, তখন শিশুর চুলও যেন মুন্ডায়ে ফেলা হয় এবং চুলগুলোর সমওজনের চাঁদি যেন খয়রাত করে দেয়া হয় এবং মাথায় জাফরান গুলিয়ে যেন লাগিয়ে দেয়া হয়। শিশুর মা-বাপ আকীকার মাংস খেতে পারে না বলে যে প্রসিদ্ধি আছে, সেটা বাজে কথা মাত্র। আকীকাকারীর এটা ইখতিয়ার রয়েছে যে, হয়তো কাঁচা মাংস বন্টন করে দিতে পারে অথবা পাকায়ে দাওয়াত করে খাওয়াতে পারে। তবে স্মরণ রাখা দরকার, যেন কোন নামদামের মানসিকতা স্থান না পায়। কেবল সুন্নাত নিয়মে যেন করা হয়। নাপিত ও কসাই এর পারিশ্রমিক আগ থেকে নির্ধারিত করে নেয়া উচিত এবং আকীকার পর পর যেন দিয়ে দেয়া হয়। যদি পারিবারিক নাপিত থাকে, তাহলে ওকেও যেন বাড়তি পারিশ্রমিক দেয়া হয়, যাতে ওর হক আদায় হয়ে যায়। একটি গরু দিয়ে কয়েকজন শিশুর আকীকা একসঙ্গেও করা জায়েয। ছেলের জন্য সাত ভাগের দু'ভাগ এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ-এ হিসেবে যেন আকীকা করা হয়। কুরবানীর গরুর মধ্যেও আকীকার ভাগ যোগ করা যায়।

বিঃ দ্রঃ আকীকা ফরয বা ওয়াজিব নয়, কেবল মুস্তাহাবী সুন্নাত। গরীব লোকের জন্য সুদী কর্জ নিয়ে আকীকা করা কখনো জায়েয নয়। কর্জ নিয়ে যাকাত দেয়াটাও নাজায়েয। আকীকা যাকাত থেকে বড় নয়। আমি অনেক গরীব মুসলমানকে কর্জ নিয়ে আকীকা করতে দেখেছি। আকীকা না করলে বেচারার নাক কাটা যায়। আফসোস! সুন্নাতের খেয়াল নেই, নাকের খেয়াল রয়েছে। এ ধরনের নাক কেটে যাওয়াটা ভাল।

খত্নার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে সাত বছর বয়সে যেন খত্না করানো হয়। খত্না সাত বছর থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত করা যায়। বার বছরের অধিক দেরী করা নিষেধ। (আলমগীরী) সাত বছরের আগেও খত্না করানো যায়। এতে কোন ক্ষতি নেই। অনেক লোক আকীকার সাথে খত্না করানোটা সহজ ও সঙ্গত মনে করে, কেননা ওসময় শিশু চলাফেরা করতে পারে না বলে কাটা ঘা বৃদ্ধি পায় না। তাছাড়া মায়ের দুধ কাটা ঘায় দিলে ঘা সহসা শুকায়ে যায়। খতনা করানোর আগে হাজামের পারিশ্রমিক নির্ধারন করা প্রয়োজন যেটা খত্না করানোর পর পর যেন দিয়ে দেয়া হয়। অভিজ্ঞ হাজাম দ্বারা খত্না করানো উচিত। কেবল এ কাজটার নাম খত্না। সামাজিক খানাপিনা, বোন ও ভগ্নিপতিদেরকে কাপড় দেয়া, মহিলাদের গান গাওয়া, পারিবারিক নাপিত-ধোপার বখ্শীশ ইত্যাদি বাজে কাজ। এগুলো মুসলমানগণকে দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয় একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত।

শিশুর লালন পালন

লালন পালনের প্রচলিত প্রথাসমূহঃ

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধি আছে যে পুত্র সন্তানকে দু'বছর এবং কন্যা সন্তানকে সোয়া দু'বছর মায়ের দুধ পান করাতে হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আজকালকার মুসলমানেরা শৈশবে সন্তানের আদব আখলাকের খেয়াল রাখে না। গরীব লোকেরাতো নিজেদের শিশুদেরকে বখাটে ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতে বাঁধা দেয় না এবং ওদের শিক্ষার সময়টা অসৎসঙ্গ ও খেলাধূলায় বিনষ্ট করে ফেলে। ওসব শিশু বড় হয়ে হয়তো ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্না দেয় অথবা জিল্লতীপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করে বা চোর-ডাকাত, মাস্তান হয়ে স্বীয় জিন্দেগী জেলখানায় অতিবাহিত করে। ধনীলোকেরা নিজেদের শিশুদেরকে প্রথম থেকে সৌখিন বানিয়ে ফেলে, ইংলিশ কাট চুল রাখা ও অপব্যয় করা শিখায়, সব সময় সার্ট পেন্ট জুতা পরায়ে ফিটফাট করে রাখে, সিনেমা ও নাচগানের জলসায় ওদেরকে সাথে নিয়ে যায়। যখন শিশুর একটু আধটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তখন কলেমাটাও শিখায় না, সোজা কে, জি স্কুলে পাঠিয়ে দেয় এবং স্কুল থেকে ইংলিশ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেখান থেকে অপচয় ও ফ্যাশনের শিক্ষা লাভ করে এবং অসৎ সংশ্রবে চরিত্র ও ইসলামী তাহজীব থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। শিক্ষা সমাপ্তির পর ভাগ্যক্রমে কোন চাকুরী পেয়ে গেলে লাটবাহাদুর হয়ে যায়। মা-বাপের আদব, স্ত্রীর হক, সন্তানের লালন পালন কিছুই জানে না। ইংরেজী শিক্ষা লাভের ফলে ওদের মস্তিষ্কের এ উন্নতিটা পরিলক্ষিত হয় যে ওরা ইংরেজদের চালচলন গ্রহণ করাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে। আর যদি কোন উপযুক্ত চাকুরী জোগাতে না পারে, তাহলে ওদের কষ্টের সীমা থাকে না। কারণ তারা স্কুল-কলেজে খরচ করতে শিখেছে, উপার্জন করতে শিখেনি, চাকরবাকর দ্বারা কাজ করানো শিখেছে, নিজে কাজ করতে শিখেনি।

نہ پڑھتے تو سو طرح کھاتے کماکر

وہ کھوتے گئے اور تعلیم پاکر

অর্থাৎ লেখা পড়া না করলে যে কোন প্রকারে উপার্জন করে খেতে পারতো, কিন্তু কুশিক্ষা লাভ করে অকেজো হয়ে গেল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন এরা জিন্দেগী যাপন করার জন্য ভদ্র বদমাইশ হয়ে যায়। জাল নোট তৈরী, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি করে স্বীয় জিন্দেগী জেল খানায় অতিবাহিত করে। (এক জরীপে দেখা যায় যে ছিনতাই কারীদের মধ্যে অধিকাংশ উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত)

এসব প্রথাসমূহের কুফল

কন্যাসন্তানকে সোয়া দু'বছর মায়ের দুধ পান করানো নাজায়েয। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দু'বছর মায়ের দুধ পান করানো উচিত। কুরআন শরীফ ইরশাদ ফরমান-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

(মায়েরা তাদের শিশুদেরকে দু'বছর দুধ পান করাবে) মা-বাপ চাইলে দু'বছরের আগেও দুধ পান করানো বন্ধ করতে পারে। তবে দুবছরের অধিক দুধ পান করানো নিষেধ। যে সব শিশু শৈশব কালে ভাল পরিবেশ পায় না, ওসব শিশু বড় হয়ে মা-বাপকে অনেক কষ্ট দেয়। আমি অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের মা-বাপকে ছেলেদের অবাধ্যতার কারণে হা-হুতাস করতে দেখেছি। অনেকে আমার কাছে এসে বলেছেন, মুফ্তী ছাহেব, একটি তাবীজ দিন, যেন ছেলে আমার কথা শুনে ও আমার বাধ্য থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ, কেবল তাবীজে কাজ হয় না, সঠিক আমলও করা চায়।

এক বুড়ো নিজের ছেলেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠিয়েছিল। যখন ছেলে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসছিল, তখন বুড়ো বাপ ছেলেকে স্বাগতম জানানোর জন্য স্টেশনে গিয়েছিল। ছেলে গাড়ী থেকে নেমে বাপকে জিজ্ঞেস করলো, বুড়ো কেমন আছ? সেই উপযুক্ত ছেলের বন্ধুরা যখন ওকে জিজ্ঞেস করলো, বুড়োটা কে? তখন সে বললো, আমার পরিচিত। বুড়ো বাপ বললো, বাবারা, আমি বাহাদুর সাহেবের পরিচিত নই বরং ওর মায়ের পরিচিত ব্যক্তি। এটা আধুনিক শিক্ষার পরিনাম।

হযরত মাওলানা আহমদ জিয়ুন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) যিনি সুলতান গাজী মুহিউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গজেবের ওস্তাদ ছিলেন এবং বাদশাহ শাহ জাহানের দরবারে খুবই সম্মানের সাথে চাকুরীরত ছিলেন। একবার জুমার দিন মাওলানার পিতা মামুলী পোষাক পরে দিল্লীর জামে মসজিদে গেলেন। ও সময় মাওলানা বাদশাহ শাহ জাহানের পাশে বসা ছিলেন। প্রথম কাতার থেকে উঠে তাড়াতাড়ি

বাপের কাছে গিয়ে বাপের জুতা পরিষ্কার করলেন, মাথার পাগড়ী দিয়ে ধুলি বালি ঝেড়ে দিলেন, হাউজে নিয়ে গিয়ে অযু করায়ে দিলেন এবং বাদশাহ শাহ জাহানের একবারে কাছে এনে বসায়ে দিলেন এবং বাদশাহকে পরিচয় করায়ে দিলেন, ইনি আমার পিতা। নামাজের পর বাদশাহ শাহজাহান ওনাকে বললেন, আপনি শাহী মেহমান হয়ে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ, আমি কেবল দেখতে এসেছিলাম যে, আমার ছেলে আপনার এখানে রয়ে মুসলমান রইলো, নাকি বেদ্বীন হয়ে গেল এবং আমাকে চিন্‌বে কিনা। খোদার শুকরীয়া, আমার ছেলে মুসলমানই আছে।

کندم از کندم برد جوز جو!

از مکافات عمل غافل مشو

অর্থাৎ যে রকম বপন, সে রকম কাটা।

শিশু লালন পালনের ইসলামী নিয়ম

ছেলে বা মেয়েকে দু'বছরের অধিক মায়ের দুধ পান করাবেন না। যখন শিশু কিছু বল্‌তে শিখে, তখন ওকে আল্লাহর নাম শিখাবেন, আগে মায়েরা শিশুদেরকে আল্লাহ আল্লাহ বলে ঘুম পাড়াতেন আর এখন রেডিও টিভির গান বাজনা শুনায়ে ঘুম পাড়ায়। যখন শিশুর একটু একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তখন শিশুর সামনে এমন আচরণ করবেন না, যাদ্বারা শিশুর স্বভাব বিনষ্ট হয়। কেননা শিশুদের মধ্যে অনুকরণ করার আগ্রহটা খুবই প্রবল। মা-বাপকে যা কিছু করতে দেখে, সেও তাই করে। ওদের সামনে নামাজ পড়ুন, কুরআন তিলাওয়াত করুন, নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যান এবং বুজুর্গানে কিয়ামের কাহিনী শুনান। শিশুদের কাহিনী শুনার খুবই আগ্রহ থাকে। শিক্ষনীয় কাহিনী দ্বারা সৎস্বভাব গড়ে উঠে। যখন আরও কিছু বুদ্ধি হয়, তখন সর্ব প্রথমে ওদেরকে পাঁচ কলেমা, ঈমানে মুজাম্মিল, ঈমানে মুফাচ্ছিল অতঃপর নামায শিক্ষা দিন। কোন মুক্তাকী হাফেজ বা মওলভীর কাছে কুরাআন পাক ও ধর্মীয় পুস্তিকাদি পড়তে দিন, যাতে শিশু বুঝ্‌তে পারে যে, সে কোন্ বৃক্ষের ডাল এবং কোন্ ডালের ফল এবং পাক-পবিত্রতা ইত্যাদির আহকাম সম্পর্কে যেন মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারে।

যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে ৪/৫টা ছেলে দান করে, তাহলে কমপক্ষে একটি ছেলেকে আলিম বা হাফিজ বানাবেন। কেননা এক হাফিজ স্বীয় তিন পুরুষ এবং এক আলিম সাত পুরুষের গুনাহ মাফ করাবেন। এটা একটা ভুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধারণা যে, আলিমের ভাত জুটে না। নিঃসন্দেহভাবে জেনে নিন যে, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা তকদীরের লিখনের অতিরিক্ত পায় না। আরবী পড়ার দ্বারা মানুষ বদমযহীব হয় না, যা কিসমতে আছে, তা পায়। বরং বাস্তবে দেখা গেছে যে সঠিক আকীদার অনুসারী সত্যিকার আলিম বড় আরামে জীবন যাপন করেন। উর্দূ কিতাবের ক'য়েক পাতা পড়ে যারা ওয়াজকে ভিক্ষার হাতিয়ার বানিয়েছে, ওদেরকে আলেমেদ্বীন মনে কর না। ওরা হলো ধর্মব্যবসায়ী। সত্যিকার আলিমের কদর ও ইজ্জত এখনও আছে। ডিগ্রীধারী শত শত বেকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর অনেক মাদ্রাসা আলিম খুঁজে পাচ্ছেনা।

ছেলেদেরকে সৌখিন বিলাসিতাপ্রিয় কর না বরং ওদেরকে সাদাসিধে জীবন যাপন ও নিজের কাজ নিজের হাতে করার শিক্ষা দিন। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল কখনও খেল্‌তে দিবেন না, কেননা এসব খেলায় কোন উপকার নেই। ওদেরকে শরীয়ত সম্মত নানা ব্যায়াম শিক্ষা দিতে পারেন, এতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং হারাম খেলাধূলা থেকে শিশুদেরকে বিরতও রাখা যায়। আমার মতে শিশুদেরকে জ্ঞান দানের সাথে সাথে কিছু হাতের কাজও শিখানো দরকার, যেন ছেলে উপার্জন করে স্বীয় পেট পাল্‌তে পারে। জেনে রাখবেন, হাতের কাজ জানা ব্যক্তি খোদার ফজলে কখনো উপবাসে মরে না। এসব শিক্ষার পর ছেলেকে ইচ্ছে করলে ইংরেজী শিখাও, কলেজে পাঠাও, জর্জ ব্যারিষ্টার বানাও কিন্তু আগে ওকে মুসলমান বানিয়ে দাও। যে স্তরে যাক না কেন, যেন মুসলমানিত্ব বজায় রাখে। আমরা দেখেছি যে, কাদিয়ানী ও রাফেজীরা ছেলেদেরকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে দুনিয়ায় অনেক উচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেয়। কিন্তু স্বীয় মযহাব সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকে। কিন্তু মুসলমানের অনেক ছেলেরা এ রকম বানর হয়ে যায় যে, স্বীয় মযহারের একটি কথাও জানে না বরং অনেকে খারাপ সংশ্রব পেয়ে বেদ্বীন হয়ে যায়। আমাদের দেশে যেসব লোক কাদিয়ানী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি হয়েছে, ওরা প্রথমে মুসলমান ছিল এবং মুসলমানের সন্তান ছিল, কিন্তু স্বীয় মযহাবী জ্ঞান না থাকায় বদ্‌মযহাবীর শিকার হয়ে গেল। মনে রাখবেন, এর শাস্তি ওদের মা-বাপকেও ভোগ করতে হবে। সাহাবায়ে কিরামের লালন-পালন নবীব বারগাহে এমন পরিপূর্ণভাবে হয়েছে যে যখন ওনারা যুদ্ধে যেতেন, উচ্চ স্তরের গাজী সাব্যস্ত হতেন, মসজিদে উচ্চ স্তরের নামাযী, বাড়ী ঘরে উচ্চ স্তরের কারবারী, কোটকাচারীতে উচ্চ স্তরের বিচারক বিবেচিত হতেন। যদি দ্বীন-দুনিয়ার কল্যান চান, তাহলে আপনার শিশুকে সেই শিক্ষার অনুসারী করুন।

পারলে নিম্নবর্ণিত কিতাব গুলো নিজে পড়ুন ও নিজের পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদেরকে পড়ান।

(১) বাহারে শরীয়ত (২) কিতাবুল আকাইদ

(৩) শানে হাবীবুর রহমান (৪) সালতানতে মুস্তাফা

মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে রান্নাবান্না, সেলাই কর্ম, ফুলের কাজ, ঘরের কাজ কর্ম, হাস-মুরগি পালন, পবিত্রতা অর্জন, লাজুকতা ইত্যাদি শিক্ষা দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাহ-শাদীর প্রথাসমূহ

বিবাহ ইসলাম ধর্মে ইবাদত বিশেষ; কোন কোন ক্ষেত্রে ফরয এবং প্রায় ক্ষেত্রে সুন্নাত। (শামী) কিন্তু বর্তমান পাক ভারত-বাংলায় হিন্দুয়ানী কুপ্রথা এবং অপব্যয়ের কারণে বিবাহ-শাদী একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিবাহের অপর নাম ছিল সংসার গঠন, সে বিবাহ এখন ওসব কুপ্রথার কারণে হয়েছে সংসার উৎপাটন। কেননা ওসব কুপ্রথার কারণে পাত্র-পাত্রী উভয় পরিবারে ডেকে আনে অশান্তি। বিবাহ উপলক্ষে তিন ধরনের কুপ্রথা প্রচলিত আছে-(১) কতকগুলো বিবাহের আগে (২) কতকগুলো বিবাহের সময় এবং (৩) কতেক গুলো বিবাহের পর। তাই আমি এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাত্রী পছন্দ, তারিখ নির্ধারণ ও মেহেদী অনুষ্ঠান

পাক ভারত-বাংলায় সাধারণত পাত্র পক্ষ এটা কাম্য করে যে ধনীর দুলালী ঘরে আসুক, যাতে পাত্রের সুনাম হয় এবং যৌতুকে ঘর পূর্ণ হয়ে যায়। পাত্রী পক্ষেরও এটা কাম্য হয়ে থাকে যে পাত্র যেন ধনবান, সৌখিন, মর্ডান ফ্যাশন দোরস্ত ক্লিন সেভ হয়ে থাকে, যাতে মেয়ে ধর্মীয় বন্ধন মুক্ত জীবন যাপন করতে পারে। আমি অনেক মুসলমানকে বলতে শুনেছি যে কোন দাড়িওয়ালাকে ওদের মেয়ে দিবে না। অনেক জায়গায় স্বচক্ষে দেখেছি যে পাত্রী পক্ষের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পাত্র দাড়ি ফেলে দিয়েছে। দুঃখের কথা কি আর বলবো, অনেককে এ রকমও বলতে শুনেছি, নামাযীকে মেয়ে দেব না, সে মসজিদের মোল্লা, আমার মেয়ের শখ-আহলাদ পূর্ণ করতে পারবে না। এ আগুনটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। যাক, যখন মনের মত পাত্র-পাত্রী মিলে যায়, তখন আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত কথাবার্তার জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়। ঐদিন উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয়। পাত্র পক্ষ থেকে নিশান স্বরূপ স্বর্ণালংকার ও কাপড়

চোপড় দিতে হয়। পাত্রী পক্ষ থেকেও পাত্রকে সোনার আংটি ও কিছু কাপড় চোপড় দেয়া হয়। প্রায় জায়গায় খাবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন জায়গায় কেবল চা-নাস্তার আয়োজন করা হয়। কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে বিবাহের আগ পর্যন্ত পাত্র পক্ষকে ঈদের সময় ঈদের সামগ্রী ও কাপড়, কুরবানীর সময় কোরবানীর পশু দিতে হয়। তাছাড়া মৌসুমী ফলমূল, মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সময়মত পৌছাতে হয়। কোন কোন জায়গায় বিবাহের তারিখ নির্ধারণ হওয়ার পর থেকে উভয় ঘরে মহিলারা একত্রিত হয়ে প্রেমের গান গাওয়া, ঢোল বাজানো ও দু'তিন দিন পর পর মিষ্টি বিতরণকে অপরিহার্য মনে করে থাকে। এতেও অনেক টাকা পয়সা অপচয় হয়ে যায়। সবচে' নিকৃষ্ট প্রথা হচ্ছে মেহেদী অনুষ্ঠান। এতে পাড়া পড়শীর যুবতী মহিলারা একত্রিত হয়ে বরের হাতে মেহেদী লাগায়, পরস্পর হাসি ঠাট্টা করে এবং বরের সাথে নানা কথা বলে রং তামাশাও করে। ইদানীং উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যান্ড শো নামে নব্য এক গান বাজনার আবির্ভাব হয়েছে। এতে বানরের মত লাফালাফি করে কয়েক জন বাদ্যযন্ত্র সহকারে বেসূরা গান গায়, সাথে সাথে উপস্থিত যুবক যুবতীরাও নাচতে থাকে। প্রায় জায়গায় এ উপলক্ষে খানাপিনারও ব্যবস্থা করা হয়। এতে অনেক টাকা পয়সা অপচয় হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আরও অনেক প্রথা পালিত হয়, যেগুলো গননা করা মুশকিল। আমি কেবল ও সমস্ত কুপ্রথাগুলো উল্লেখ করলাম, যেগুলো প্রায় জায়গায় সামান্য তারতম্যে পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত প্রথাগুলোর ক্ষতিসমূহ

পয়সাওয়ালা পাত্র-পাত্রী তালাশ করাটা মারাত্মক ভুল। একেতঃ পয়সাওয়ালা তালাশ করতে গিয়ে অনেক পাত্র পাত্রীর যৌবন অতিক্রম হয়ে যায়; মনের মত পয়সা ওয়ালা পাওয়া যায়না এবং বিবাহও হয় না। যুবতী মেয়ে মা-বাপের জন্য বিরাট পাহাড় তূল্য। ওকে বিবাহবিহীন ঘরে রাখাটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও সমস্ত অপকর্মের মূল। দ্বিতীয়তঃ যে মায়া-মহব্বত ও আদব-আখলাক গরীবদের মধ্যে আছে, সেটা ধনীদের মধ্যে নেই। তৃতীয়তঃ ধনীদেরকে আপনি স্বীয় গায়ের চামড়া খুলে দিলেও ওদের চোখে লাগে না। অভিযোগ হতেই থাকে যে আমি কিছুই পেলাম না। যদি পাত্রী পক্ষ ধনী হয়, তাহলে স্বামী শ্বাশুর বাড়ীতে চাকরের মত সমাদৃত হয়। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন পাত্তা থাকে না। আর যদি পাত্র ধনী হয়, তাহলে পাত্রী ওর ঘরে বাঁদী বা চাকরানীর মত হয়ে থাকে। পাত্রী পক্ষের প্রধানতঃ পাত্রের তিনটি বিষয় দেখা উচিত-এক সুস্থ হওয়া, কেননা

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিন্দেগীর আরাম-আয়েশ সুস্থতার উপর নির্ভরশীল, দুই, চাল চলন ভাল হওয়া, লম্পট না হওয়া, ভদ্র হওয়া, তিন, পেশাজীবী ও উপার্জনক্ষম হওয়া, যেন স্বীয় স্ত্রী ও ছেলেপিলে লালন-পালন করতে পারে। ধনদৌলতের কোন নির্ভরশীলতা নেই। সেটা চলমান চাঁদের আলোর মত। আজকে আছে, কালকে নেই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিবাহে কেউ সম্পদ দেখে, কেউ দেখে সৌন্দর্য। কিন্তু তুমি ধর্মপরায়নতা দেখ। এটাও স্মরণ রেখো যে, তিন ধরনের মালের মধ্যে বরকত নেই এক, জমীনের পয়সা অর্থাৎ জমীন বা ঘর বিক্রি করে খাওয়া। এতে কোন বরকত নেই। এটা উচিত যে জায়গা জমি বিক্রি না করা। যদি বিক্রি কর, তাহলে সেই পয়সা জমিতেই খরচ কর। (আল-হাদীছ) দুই, মেয়ের টাকা পয়সা অর্থাৎ পাত্রী পক্ষ পাত্র পক্ষ থেকে যে টাকা পয়সা নিয়ে মেয়ে বিবাহ দেয়, সে টাকাতে কোন বরকত নেই বরং টাকা নেয়াটা হারাম। কেননা এটা হয়তো মেয়ের মূল্য অথবা ঘুষ, উভয়টা হারাম। তিন, সেই যৌতুক যেটা পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষ থেকে আদায় করে। সেই যৌতুককে জীবন অতিবাহিত করার উপায় মনে করাটা, মারাত্মক ভুল। সেটাতে কোন বরকত নেই। নিজের শক্তির উপর ভরসা কর।

দাড়ি ও নামায নিয়ে রসিকতাকারী কাফির। এটা স্মরণ রাখবেন যে আলেম ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের স্ত্রীগণ ফ্যাশন পূজারী ব্যক্তিদের স্ত্রীদের থেকে অনেক আরামে থাকে। কেননা দীনদার ব্যক্তিরা আল্লাহর ভয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের হকের কথা স্মরণ রাখে, এবং ওদের দৃষ্টি কেবল স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু আযাদ প্রকৃতির লোকদের ক্ষণস্থায়ী স্ত্রী অনেক হয়ে থাকে। ওরা সব ফুলের ঘ্রান নেয় এবং সব বাগানে ঘুরা ফেরা করে। কিছু দিন স্বীয় স্ত্রীর প্রতি মহব্বত ভালবাসা ব্যক্ত করে চোখ অন্য দিকে ফিরায়ে নেয়।

বিবাহ পূর্বের কুপ্রথাগুলোর ক্ষতি বর্ণনার বাইরে। অনেক লোক সুদী কর্জ নিয়ে বা কারো থেকে ধার নিয়ে স্ত্রীকে স্বর্ণালংকার প্রদান করে। বিবাহের পর নববধু থেকে সেই স্বর্ণ নানা তাল বাহানা করে নিয়ে ফেরত দিয়ে দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভীষণ ঝগড়া বিবাদ হয় এবং এ ঝগড়া বিবাদ আজীবন লেগে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এ রকম হয়ে থাকে যে বিবাহের কথা বার্তা পাকাপোক্ত হওয়ার পর ভেঙ্গে যায়। তখন পাত্রী পক্ষ থেকে পাত্র পক্ষের প্রদত্ত স্বর্ণালংকার ফেরত চাওয়া হয়। এদিকে পাত্র পক্ষের কাছে পাত্রী পক্ষ কৃত বিভিন্ন খরচের ক্ষতি পূরণ দাবী করা হয়। অনেক সময় এ রকম ঝগড়া বিবাদ কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

অনেক পাত্র পক্ষ বিবাহের আগের খরচাদি সামাল দিতে গিয়ে হিসমিস খেয়ে যায়। বিবাহের সময় মনোযোগসহকারে দেখে যে পাত্রী পক্ষ সেই পরিমাণ যৌতুক, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি দিল কিনা, যা বিবাহের আগে পাত্র পক্ষ দিয়ে ছিল। যদি পাত্রী পক্ষ সেই পরিমাণ না দেয়, তাহলে মেয়ের জান শূলির উপর থাকে, অহরহ বিভিন্ন কথায় ওকে জর্জরিত করে। আর যদি যথেষ্ট দিয়েও থাকে, তবুও নিস্তার নেই। তখনও অনেক কথা শুনতে হয়।

মেহেদি অনুষ্ঠানটা হচ্ছে সবচে' মারাত্মক কুপ্রথা ও অনেক হারাম-কাজের সমাহার। এ ধরনের কূপ্রথা কঠোর হস্তে দমন করা উচিত।

ইসলামী বিয়ম সমূহ

শরীফ ও দীনদার পাত্র-পাত্রী তালাশ করা উচিত, যেন পরস্পরের মধ্যে মিল-মেলামেশা থাকে। যেখানে ছেলের ইচ্ছে নেই, ওখান থেকে বিবাহ করানো কক্ষনো উচিত নয়। অনুরূপ যেখানে মেয়ের বা মেয়ের মায়ের ইচ্ছে নেই, ওখানে মেয়েকে বিবাহ দেয়া বিষ পান তুল্য। এ রকম বিবাহ ফলপ্রসূ হয় না। এ জন্য শরীয়ত মতে এটা একান্ত প্রয়োজন যে, মেয়ের অনুমতি নেয়ার সময় ছেলের নাম, ছেলের বাপের নাম ও মোহরের কথা উল্লেখ করে যেন বলা হয় যে, হে বেঠী, আমরা তোমারে অমুকের ছেলে অমুকের সাথে বিবাহ দিচ্ছি। মেয়ে হ্যাঁ বলার পরই বিবাহ শুদ্ধ হবে। এ অনুমতি মেয়ের মতামত জানার জন্যই নেয়া হয়। যদি সুযোগ হয়, প্রস্তাব পাঠানোর আগে ছেলে কর্তৃক গোপনভাবে মেয়ে দেখাটা জায়েয আছে। বিবাহের আগে নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথে পরামর্শ করাটাও উত্তম। আল্লাহ তাআলা ফরমান- وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ-

এরকম বিবাহে সমস্ত আত্মীয় স্বজন জিম্মাদার হয়ে যায় এবং যদি বর-কনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, তাহলে এরা সবাই মিলে আপোষের চেষ্টা করে। বিবাহের জোড়া-গাঁথা (ENGAGEMENT) টা বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি। এ আনুষ্ঠানিকতা না করলেও চলে। এ অনুষ্ঠানটা বন্ধ করা গেলে, অনেক কুপ্রথা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই যে কোন উপায়ে এ অনুষ্ঠানটা একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত। এর ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই। সম্ভবতঃ আমরা এ কুপ্রথাগুলো হিন্দুদের থেকে শিখেছি। কেননা ভারত বর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এ সব কুপ্রথার কোন অস্থিত্ব নেই। আরবী ফার্সী ভাষায় এর কোন নামও নেই। এ অনুষ্ঠানের যত নাম পাওয়া যায়, সব হিন্দী ভাষা থেকে উৎপন্ন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি জোড়াগাঁথা অনুষ্ঠানটা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে এভাবে করতে পারে যে ছেলের আত্মীয় স্বজন একত্রিত হয়ে মেয়ের বাড়ীতে যাবে। মেয়ের পক্ষ কেবল চা-বিস্কুট দ্বারা মেহমানদারী করবে, কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য ও খানাপিনার আয়োজন করবে না। ছেলের পক্ষ মেয়ের জন্য একটি সূতির কাপড় ও একটি স্বর্ণের নাক ফুল নিয়ে যাবে এবং মেয়ের পক্ষ ছেলের জন্য একটি সূতির রুমাল ও একটি চান্দির আংটি দিতে পারে, যেটা চার রত্তির অধিক নয়। অবশ্য ছেলের পক্ষ যদি অন্য শহর থেকে আসে, তাহলে কন্যা পক্ষের তরফ থেকে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করা উচিত এবং ছেলের পক্ষ থেকে সাতজনের অধিক আসাটা অনুচিত। এ সময় মহল্লাবাসীকে দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর বিবাহের আগে পাত্র পক্ষের লোকেরা যতবার আসা-যাওয়া করুক না কেন, যেন কাপড় চোপড় ও মিষ্টির জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করা না হয়। যদি স্বেচ্ছায় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সামান্য মিষ্টি দ্রব্য নিয়ে আসে, সেটা পাড়া-পড়শীর মধ্যে বন্টন করার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একে অপরকে হাদিয়া দিন, মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ হাদিয়াকে এ রকম ট্যাক্সে পরিণত কর না যে বেচারা হাদিয়া ছাড়া আসতেই পারে না।

তারিখ নির্ধারণটাও সাদাসিধেভাবে করা উচিত। একই শহরে হলে দু'চারজন এসে তারিখটা ঠিক করে যাবে এবং সেটা চা-নাস্তার মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হবে। অন্য শহর থেকে আসলে যেন দু'তিন জনের অধিক না হয়। তখন অবশ্য খানার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব কাজে বয়স্ক লোক মনোনীত করা উচিত। বিবাহের দিন শুক্রবার বা সোমবার হওয়া উত্তম। কেননা এ দু'দিন খুবই বরকতময়। বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর উভয় পরিবারে গান-বাজনার যে কুপ্রথা প্রচলিত আছে, সেটা সমূলে উচ্ছেদ করা একান্ত কর্তব্য। যদি সম্ভব হয়, ওসব গান বাজনার পরিবর্তে দু'তিন দিন পর পর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে না'ত খানি, দরূদ শরীফ তিলাওয়াত এবং প্রচলিত কু প্রথার কুফল বর্ণনা পূর্বক ওয়াজ করা যায়। মেহেদী অনুষ্ঠানের কু প্রথাটা একেবারে বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন। মেয়েদের হাতে ঘরোয়াভাবে মেহেদী দেয়াটা কোন দোষের নয়। অনেক জায়গায় পাত্র-পাত্রীর সুগন্ধি একত্রিত করার যে প্রথা প্রচলিত আছে, সেটাও কোন দোষের নয়। সুগন্ধি আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খুবই পছন্দ ছিল। বরং বিবাহের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করাটা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত আছে। কিন্তু এসব কাজের সাথে হারাম কাজের সংমিশ্রণ ঘটতে কিছুতেই দেয়া যায় না। দীন

দুনিয়ার সমস্ত কাজে-হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ উভয় জাহানের জন্য কল্যাণকর।

এ যুগে কতেক লোক বরকে চান্দির অলংকার পরিধান করায় বা চাকু ওর সাথে রাখতে দেয়, যেন ওকে কোন ভূতপরী স্পর্শ করতে না পারে। এসব নাজায়েয, কুপ্রথা মাত্র। যদি বরের মনে কোন ভয়ভীতি থাকে, তাহলে সকাল সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসী পড়ে নিজের শরীরে যেন ফুঁক দেয়। খোদার ফজলে নামাযী ব্যক্তিকে প্রেতাত্মা স্পর্শ করতে পারেনা। কুরআন পাকই হচ্ছে উত্তম সহায়ক, সেটারই অনুসরণ করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও বধু বিদায়ের প্রথা সমূহ

বিবাহের সময় বর ও কনের ঘরে দু'ধরনের প্রথা পালিত হয়। বরের ঘরে বরকে পারিবারিক নাপিত গোসল করায়, নতুন কাপড় পরিধান করায়, অতঃপর মাথায় লাল রং এর পাগড়ী বেঁধে এর উপর সোনালী রং এর ফিতা মোড়ায়ে দেয়। এরপর ওটার উপর টোপর পরানো হয়, যেটার উপর ফুলের পাপড়ী ও মুতির মালা লাগানো থাকে। নাপিত এসব কাজ করার পর বরের সামনে একটি পাত্র রাখে, সেটাতে সকল পুরুষ আত্মীয় স্বজন টাকা পয়সা ফেলে। অতঃপর মহিলা আত্মীয় স্বজনরাও সেটাতে টাকা-পয়সা ফেলে এবং এ টাকা পয়সার অধিকারী নাপিতের স্ত্রীই হয়ে থাকে। এভাবে বরযাত্রার আগে আত্মীয় স্বজন আনাগোনা করতে থাকে এবং খানাপিনার পর নাপিতের পাত্রে কিছু দিয়ে যায়। ও সময় বরের নানা-মামার করুণ অবস্থার প্রতি দয়া হয়। কেননা ওদের উপর মোটা অংকের উপহার ধার্য হয়। অন্যথায় নাক কাটা যায়। এ প্রথার কারণে অনেক ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। এ প্রথার অধীনে বরের নানা বা মামাকে বর ও বরের সমস্ত নিকট আত্মীয়কে কাপড়, নগদ টাকা এবং খাদ্যশস্য দিতে হয়। অনেক জায়গায় চল্লিশ/পঞ্চাশের অধিক কাপড় দিতে হয়। আমি এমন এক দোকানদারকে দেখেছি, তিনি বড় আরামে জিন্দেগী যাপন করছিল। ভাগিনীর বিবাহ সম্মুখীন হয়ে পড়ায়, সে অস্থির হয়ে পড়ে। আমি ওকে এ ধরনের মোটা অংকের উপহার না দেয়ার জন্য অনেক বুঝালাম এবং একান্ত অপারগতায় সাধ্যমত দেয়ার জন্য বললাম। কিন্তু সে আমার কথা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই দোকান উপহারের সামগ্রী যোগান দিতে গিয়ে হাত ছাড়া হয়ে গেল। এখন সে খুবই অভাব অনটনে পতিত হয়েছে। ভাগিনীর বিবাহে কাপড় প্রদান ছাড়াও ভাগিনীকে অলংকার বা খানাপিনার জিম্মাদারী মামাকে নিতে হয়। মোট কথা একটি বিবাহে চারটি ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। এসব প্রথার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর বর যাত্রী রওয়ানা হয়। বর যাত্রীর আগে বাদক দল থাকে, কোন কোন জায়গায় নাচওয়ালীও থাকে এবং আতশবাজিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। বরের পক্ষ থেকে এক মন চিনি, উল্লেখযোগ্য নারিকেল, কিসমিস, বাদাম ইত্যাদি ও ত্রিশ সের কাঁচা দুধও সাথে নেয়া হয়। কনের বাড়ীতে গিয়ে এসব জিনিস কনের পক্ষকে গছিয়ে দেয়া হয়, যেটা বিবাহের পর বন্টন করা হয়। বর যাত্রী কনের ঘরে পৌছার পর ব্যাপকভাবে আতশবাজি ফুটানো হয় এবং ফুলের পাঁপড়ি ছিটানো হয়। অতঃপর সমস্ত বর যাত্রীদেরকে কনের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হয়। এরপর আকদ হয়। অতঃপর বরকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কনের মুখ দেখানোর জন্য সেখানে আগ থেকে অনেক মহিলা সমবেত হয়ে থাকে। ও সময় অনেক পর্দানশীল মহিলারাও বিনা সংকোচে বরের সামনে এসে যায়। তখন অশ্লীল ভাষায় গান গাওয়া হয়, শালীরা নানা রকম মসকরা করে। ভাবীরা নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় করে নেয়। বিদায়ের আগে বর পক্ষকে যৌতুকের জিনিস বুঝায়ে দেয়া হয়। যৌতুকের মধ্যে তিন ধরনের জিনিস হয়ে থাকে-প্রথমতঃ বরের আত্মীয় স্বজনের জন্য কাপড় যেমন বরের মা-বাপ, দাদা দাদী, নানা-নানী, মামা-মামী, ভাই, চাচা-চাচী, চাকর-চাকরানী, নাপিত সবাইকে অবশ্যই কাপড় দিতে হয়। অনেক জায়গায় আশি নব্বই খানা পর্যন্ত কাপড় দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ফার্নিচার অর্থাৎ পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আলমিরা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সামগ্রী। যৌতুক বুঝায়ে দেয়ার পর কনেকে পালকীতে উঠানো হয় এবং বর ঘোড়ায় আরোহন করে। অবশ্য ইদানীং যানবাহনের প্রচলন হয়েছে। এ বিদায়ক্ষণে বাড়ীর মহিলাদের কান্নার রোল ও ঢোলের কানফাটা আওয়াজে সবাইকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এগুলো ছাড়া এমন অনেক প্রথা পালন করা হয়, যেগুলোর বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ হচ্ছে। কারণ এ বই অমুসলিমদের হাতেও যেতে পারে। তখন আমাদের সম্পর্কে কী যে ধারণা করবে। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতিকে বর্জন করে এমন কু প্রথার অনুসারী হয়েছি, যেগুলো ডোম-চামারদের মধ্যেও নেই।

এসব কুপ্রথাগুলোর ক্ষতি সমূহ

উপরোক্ত প্রথাগুলোর ক্ষতিসমূহের কথা কি আর বলবো। কেবল এতটুকু

বলতে চাই যে ওসব কুপ্রথা ধনী মুসলমানদেরকে কাঙালে পরিণত করেছে, ঘরের মালিকদেরকে ঘর ছাড়া করেছে, মুসলমান এলাকা হিন্দু এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের সামনে এ রকম শত শত উদাহরণ হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ এসব প্রথার দ্বারা একেতঃ সম্পদের বিনাশ, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার নাফরমানী প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ এসব কাজ নিজের নামের জন্য করা হয়। অথচ বদনামী ছাড়া অন্য কিছু অর্জিত হয় না। প্রায় বিবাহে বর যাত্রীরা খাবার নিয়ে নানা সমালোচনা করে থাকে। যেমন ঘি ঠিকমত হয়নি, লবণ অধিক হয়েছে, মরিচ ভাল ছিল না। অনেক সময় এসব সমালোচনার দ্বারা কনেকে অতিষ্ঠ করে তুলে।

একটি সূক্ষ্ম কথাঃ এটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, বিবাহ-আসরে উন্নত খাবার খেয়েও বর যাত্রীরা প্রশংসা করে না বরং বিভিন্ন খুঁত বের করে। কিন্তু আওলীয়া কিরাম ও পীর-মুরশিদদের ঘরে শুক্না রুটি ও ডাল ভাত জুটলেও সেটাকে তবরুক মনে করে সানন্দে গ্রহণ করে। অনেকে সেই শুক্না রুটি তবরুক হিসেবে ছেলেমেয়েদের জন্য বিদেশেও পাঠায়। আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ ও অন্যান্য পীর আওলীয়ার মাযারে গিয়ে দেখুন, সেখানে লোকেরা ডাল-রুটির জন্য কী রকম করে। এর একমাত্র কারণ হলো বিবাহ শাদীর খানাপিনা মখলুককে সন্তুষ্ট করার জন্য তৈরী করা হয় আর পীর আওলীয়ার দরবারে খালেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তৈরী করা হয়। যদি আমরাও বিবাহ শাদীতে খানা পিনা, যৌতুক ইত্যাদি সুন্নাতের নিয়তে সুন্নাত তরীকা মতে করে থাকি, তাহলে কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। আমার বিশিষ্ট বন্ধু শেঠ আবদুল গণী সাহেব প্রতি বছর কোরবানীর সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে কোরবানী করেন এবং পোলাও তৈরী করে সাধারণ মুসলমানদের দাওয়াত করেন। আমি এমন লোককে দেখেছি, যিনি কদাচিৎ বিবাহ শাদীতে যোগদান করে, তিনিও সেই দাওয়াতে যোগ দিতেন এবং উচ্ছিষ্ট কিছু পেলেও সেটাকে তবরুক মনে করে খেতেন। সম্প্রতি আঞ্জুমানে খোদ্দামুছ ছুফিয়ার সভাপতি মাওলানা ফজল ইলাহী সাহেব সুন্নাত অনুসারে সুন্নাতের নিয়তে ওলীমার দাওয়াত করেছিলেন, দাওয়াত খেয়ে কেউ কোন রকম সমালোচনা করলো না। আসল কথা হলো, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম মুবারক

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোষ ত্রুটি বিলুপ্তিকারী। যে জিনিসে হুযূরের নাম নেয়া হয়, সেটা থেকে সব দোষত্রুটি বিদূরীত হয়ে যায়। যদি আমরাও ওলীমার খাবার সুন্নাতের নিয়তে করি, তাহলে ডাল ভাতও যদি মুসলমানদের সামনে রাখা হয়, সেটা মুসলমানগণ বরকতের নিয়তে তৃপ্তি সহকারে খাবে।

তৃতীয়তঃ এসব কুপ্রথার কারণে গরীব পরিবারের মেয়েরা অবিবাহিত রয়ে যায় এবং ধনী পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়। কেননা লোকেরা ছেলেদের বিবাহের পয়গাম ওসব ঘরে পৌঁছায়, যেখানে অধিক যৌতুক পাওয়া যায়। যদি প্রত্যেকের জন্য যৌতুকের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে যেত, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের মেয়ের বিবাহ যথাসময়ে হয়ে যেত।

চতুর্থতঃ এসব কুপ্রথার কারণে অনেক মুসলমান কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারো ঘরে মেয়ে জন্ম হলে, সে মনে করে যে আমার ঘরবাড়ী, দোকানপাট হাতছাড়া হয়ে গেল। উপরোক্ত কুপ্রথার কারণে মেয়ে জন্ম হলে লোকেরা ভয় পেয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ ছেলের পরিবার মেয়ের পরিবারের আপন হয়ে যাওয়া। বিবাহের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মিলানো। এ বিবাহ হচ্ছে দু'টি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী। বিবাহে ছেলে দিয়ে মেয়ে এবং মেয়ে দিয়ে ছেলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান মুসলমানেরা মনে করে যে বিবাহ হচ্ছে সম্পদ আহরনের একটি মাধ্যম। যার চার ছেলে আছে, সে মনে করে যে ওর চারটি ঘরবাড়ী হয়ে গেল এবং যৌতুকে ওর ঘর ভরে যাবে। যদি কনে যৌতুক না আনে, তাহলে দু'পরিবারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইদানীং বিবাহই প্রধানতঃ পারিবারিক কোন্দলের মূল কারণ। অনেক সময় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহ হলে, পুরানো সম্পর্কটাও ছিন্ন হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ হলো বিবাহকে একটি আর্থিক কারবার হিসেবে ধরে নিয়েছে।

ষষ্ঠতঃ কারো কয়েক ছেলে আছে। প্রথম ছেলের বিবাহ খুব জাঁকজমকের সাথে হলো, অনেক টাকা পয়সা খরচ করলো। সেই বিবাহে ওর সব টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেল। বাকী ছেলেদের বিবাহে টাকা পয়সা সে রকম খরচ করতে পারলো না। টাকা পয়সার অভাবে কোন প্রথাও যথাযথ পালন করতে পারলো না। কোন মতে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করলো। এতে ওই ছেলেদের মনে মা-বাপের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সৃষ্টি হলো যে, আমাদের বড় ভাই-এর মধ্যে এমন

কি গুণ ছিল, যেটা আমাদের মধ্যে নেই। এর ফলে বাপ ও ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

সপ্তমতঃ অনেকে ছেলের বিবাহে এত খরচ করে যে শেষ পর্যন্ত ঘরটাও বন্ধক দিতে হয় এবং বিরাট কর্জের বোঝা মাথার উপর চেপে বসে। অনেক ক্ষেত্রে নববধু ঘরে আসতে না আসতে ঘরটাও হাতছাড়া হয়ে যায় এবং অনেক অভাব অনটনে পতিত হয়। কিন্তু বদনামটা নবধুর হয়ে থাকে। মনে করে যে নববধু এমন অপয়া যে ঘরে আসার সাথে সাথে ঘরের আয় বরকত কমে গেল। এভাবে শুরু হয়ে যায় ঘরোয়া কোন্দল, পারিবারিক জ্বালাতন। আসলে বেচারী নববধুর কোন দোষ নয় বরং হিন্দুয়ানী প্রথাই এর জন্য দায়ী।

অষ্টমতঃ এ প্রথাগুলো পূর্ণ করার জন্য গরীব লোকেরা মেয়ে জন্ম হওয়ার পর পরই চিন্তিত হয়ে পড়ে। মেয়ে বড় হওয়ার সাথে সাথে ওদের চিন্তাও বেড়ে যায়। খানাপিনা কিছুই ভাল লাগে না। শুধু এ চিন্তায় থাকে যে কিভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায় এবং বিবাহের প্রথাগুলো পূর্ণ করা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা হলে ওটার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং হজ্বও ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু ওরা সেটা আদায় করে না। কেননা এগুলো আদায় করতে গেলে, শয়তানী প্রথাগুলো পূর্ণ করা যাবে না। আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছি, যার কাছে প্রায় এক লাখ টাকা জমা ছিল। আমি ওকে বললাম আপনার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে, হজ্ব করে আসুন। সে বললো, আমার জন্য বড় হজ্ব হচ্ছে মেয়ের বিবাহ এবং এর যৌতুক। আমি বললাম, বিবাহের খরচাদির খাতগুলো নিজেদের সৃষ্টি, সেটা ফরজ নয়। কিন্তু হজ্ব ফরয। সে বললো, যা হোক, হজ্ব না করলেতো নাক কাটা যাবে না। শেষ পর্যন্ত, হজ্ব করলো না, মেয়ের বিবাহে সব টাকা পয়সা খরচ করলো। আপনারাও নিশ্চয় এমন অনেক পয়সাওয়ালাকে দেখে থাকবেন যে ধুমধামের সাথে একটার পর একটা মেয়ে বিবাহ দিতে রইলো কিন্তু হজ্ব নছীব হলো না। এটা লক্ষ্য রাখা দরকার যে সামর্থবান প্রত্যেকের উপর হজ্ব করা ফরয। বৃদ্ধকালে হজ্ব করার মনোভাব ভুল। কেননা বৃদ্ধকাল আসতেও পারে, নাও আসতে পারে এবং এ টাকা পয়সা তখন থাকবে কিনা, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

নবমতঃ গরীব লোকেরা মেয়ের ছোট কাল থেকেই কাপড় চোপড় সংগ্রহ করতে থাকে। কেননা এক সাথে ওগুলো যোগাড় করা সম্ভব নয়। মেয়ে বড় হতে হতে কাপড়গুলো নরম হয়ে যায়। এ কাপড় বেশী দিন পরা যায় না। ফলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাদেরকে এ কাপড় দেয়া হয়, ওরা সমালোচনা মুখর হয়। এবং বলে যে, এ ধরনের কাপড় দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

দশমতঃ কন্যা পক্ষ অনেক কষ্টের বিনিময়ে টাকা-পয়সা খরচ করে বরকে ফার্নিচার দিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক বরের ঘরে সেই ফার্নিচার রাখার জায়গাও থাকে না। আর যদি বর ভাড়া ঘরে থাকে, তাহলে দু'চারবার ঘর পরিবর্তন করার দ্বারা ফার্নিচারগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। যত টাকার যৌতুক দেয়া হলো যদি সে টাকাগুলো নগদ দেয়া হতো বা সেই টাকার দ্বারা মেয়ের নামে কোন দোকান বা ঘর খরিদ করে দেয়া হতো, তাহলে বরের কাজে আসতো এবং এর ছেলেরা আজীবন দু'আ করতো এবং স্বামীর বাড়ীতে মেয়ের কদরও বাড়তো। খোদা না করুক, মেয়ের উপর যদি কোন সময় কোন মছীবত আসে, তাহলে সে ঘর বা দোকানের ভাড়া দ্বারা কোনমতে জীবন যাপন করতে পারতো।

কয়েকটি বাহানা

যখন এসব কুপ্রথার ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচিত হয়, তখন অনেক মুসলমানেরা নানা অজুহাত পেশ করে থাকে। যেমন অনেকে বলে থাকে যে আমরা কি করবো, আমাদের বৌ-পোলারাতো মানতে চায় না। তাই আমাদেরকে এসব অপব্যয় বাধ্য হয়ে করতে হয়। এটা কোন অজুহাত নয়। বাস্তব কথা হলো, পুরুষদেরও আধা আধি সম্মতি থাকে। তখন স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে জিদ ধরে। তা নাহলে আমার ঘরে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ কিভাবে হতে পারে। কোন সময় তরকারীতে লবণ একটু বেশী হয়ে গেলে বেচারী স্ত্রীকে নানা কথা শুনতে হয় কিন্তু স্ত্রী কন্যা বা ছেলেপিলে কোন সময় নামায না পড়লে, এর কোন খবরও নেয়া হয় না। জেনে রাখুন, আল্লাহতাআলা নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অনেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের দেখা গেছে যে, ওদের ছেলের বিয়েতে বরযাত্রীর আগে আগে নাচওয়ালী বাদক দল নেচে গেয়ে ও বাদ্য বাজিয়ে যাচ্ছে আর এরা পিছনে পিছনে তসবীহ হাতে 'লা হাওলা, 'লা হাওলা' পড়ে যাচ্ছে আর বলে যে কি করবো, ছেলেতো মানতেছে না। আসলে এ 'লা-হাওলা' হলো ওর জন্য আনন্দ ধ্বনি। পাঞ্জাবে এ রকম একটা নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মেয়েরা মীরাছ (পৈত্রিক সম্পত্তি) পায় না। কোটিপতির বাপের ইন্তেকালের পর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ছেলেরা হয়ে যায়। মেয়েরা এক পয়সাও পায় না। তখন এটাই অজুহাত দেখানো হয় যে মীরাছের পরিপূরক মেয়েদের বিবাহ ব্যাপক জাঁকজমক

সহকারে করা হয়েছে। কি অদ্ভুত কথা! নিজের নামের জন্য টাকা পয়সা হারাম কাজে অপব্যয় করলো আর সে টাকা মেয়ের অংশ থেকে কাটা হলো। ছেলের বিবাহ ও ওদের লেখাপাড়ার জন্য যে টাকার পয়সা খরচ হয়, সেটাতো কখনো মীরাছ থেকে কাটা হয় না। তাহলে এটা কোন্ ধরনের ধোঁকা।

অনেকে বলে থাকে যে, ওলামায়ে কিরাম এসব কথা আমাদেরকে আগে বলেননি, যার জন্য আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। এ প্রথাগুলো যখন চালু হয়ে গেছে, এখন আর এগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয়। এটাও একটা মিথ্যা অজুহাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কিত অনেক কিতাব লিখেছেন কিন্তু মুসলমানেরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। যেমন ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ফাযেলে বেরলভী (কুঃ সিঃ) জলিউল ছাওত, হাদিউল নাস ইলা আহকামিল আরাসা, 'মরওজাহুন নাজা' কিতাবে প্রচলিত কু প্রথার কুফল বর্ণনা দিয়েছেন এবং সাথে সাথে ইসলামী আহকামের কথাও উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক সুন্নী ওলামায়ে কিরাম এসব বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। কিন্তু আফসোস, নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে।

কেউ কেউ বলে যে, বিবাহ শাদীতে এসব প্রথা সমূহ না থাকলে লোকের সমাগম হবে না। ফলে বিবাহটা হবে নিষ্প্রাণ, কোন জাঁকজমক হবে না। এটাও একটা ভুল ধারণা ও ধোকাবাজী। সত্য কথা হচ্ছে বিবাহ শাদীতে যদি সুন্নাতের নিয়তে অংশ গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটা ইবাদত হিসেবেও গণ্য হয়। এখনতো আমাদের বিবাহ শাদীতে লোকেরা তামাশা দেখতে ও খাওয়ার জন্য আসে। এতে কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না। ইনশা আল্লাহ যখন ইবাদতের নিয়তে আসবে যেমন লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যায়, তখন ইনশা আল্লাহ সৌন্দর্য অন্য রকম হবে এবং অন্য রকম পরিবেশও সৃষ্টি হবে। কিছুদিন আগে গুজরাটেরা জনাব ফজল ইলাহী সাহেবের বাসভবনে এ রকম একটি সাদাসিধে বিবাহ হয়েছিল, যেখানে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে আমি আজ পর্যন্ত এত লোক অন্য কোন বিবাহে দেখিনি। অনেক লোক অযু করে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে বরের সাথে গমন করেছিলেন।

অনেকে বলে যে, লোকেরা আমাদের উপর এ অপবাদ দিবে যে আমরা খরচ কমানোর জন্য এ প্রথাগুলো বন্ধ করে দিয়েছি। আবার অনেকে বলে যে এ ধরনের বিবাহ কুলখানির মত মনে হবে। যেখানে নাচ গান বাদ্য বাজনা কিছু নেই, সেখানে কোন আনন্দ নেই। এগুলো কোন অজুহাত নয়। একটি সুন্নাতকে জীবিত করার মধ্যে শত শহীদের ছওয়াব রয়েছে। এ ছওয়াব কি অনায়াসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিলবে? প্রথম প্রথম লোকদের অনেক অপবাদ টিটকারী সহ্য করতে হবে। এখনও কি অপবাদ দেয়া হয় না? কোন সময় খানাপিনার অভিযোগ, কোন সময় যৌতুক নিয়ে সমালোচনা, মোট কথা কোন অবস্থাতে লোকের অপবাদ থেকে রেহাই নেই। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণ লোকদের অপবাদ দোষ চর্চা থেকে রেহাই পাননি, সেখানে আপনারা কিভাবে রক্ষা পেতে পারেন? এটাও স্মরণ রাখবেন, প্রথমেতো কিছু অসুবিধা হবে কিন্তু পরে ইনশা আল্লাহ সেই অপবাদ দানকারীরাও আপনাকে দু'আ করবেন এবং মধ্যবিত্ত ও গরীব জনসাধারণের অনেক মুশকিল আসান হয়ে যাবে এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তুষ্ট হবেন।

বিবাহ শাদীর ইসলামী নিয়ম সমূহ

নিজের ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য হযরত খাতুনে জান্নাত, শাহজাদীয়ে ইসলাম ফাতিমাতুয যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর পবিত্র বিবাহকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম। এটাও বুঝতে চেষ্টা করুন যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি ইচ্ছে করতেন যে তার কলিজার টুকরার বিবাহ মহা ধুমধামের সাথে হোক এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে যদি উপহার সামগ্রী নিতেন, তাহলে তখন হযরত উসমান গনী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ধন ভান্ডার উজাড় করে দিতেন, যিনি এক এক যুদ্ধের জন্য অগনিত উট ও সোনার আশরফী দান করতেন। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, এ বিবাহ কিয়ামত পর্যন্ত যেন মুসলমানদের জন্য নমুনা হয়ে থাকে, সেহেতু একান্ত সাদাসিধেভাবে ইসলামী রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

সুতরাং মুসলমানগণ! সর্বপ্রথম আপনাদের বিবাহ শাদী থেকে সমস্ত হারাম প্রথাসমূহ অপসারিত করুন। বাজনা, আতশবাজী, মহিলাদের গান, পারিবারিক ভোম-চামারের গান, নাচওয়ালীদের নাচ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, আল্লাহর নাম নিয়ে এসব একেবারে বন্ধ করে দিন। অন্যান্য অপব্যয়ের প্রথাগুলো হয়তো বন্ধ করে দিন অথবা এমনভাবে সীমিত করুন যেন অপব্যয় বলা না যায় এবং সেটা যেন ধনী-গরীব সবাই আদায় করতে পারে। আমার মতে বিবাহের প্রথাগুলো এভাবে আদায় হওয়া উচিত।

নানা বা মামার উপর মোটা অংকের উপঢৌকন দেয়ার যে কুপ্রথা প্রচলিত আছে, সেটা যেন একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়। বর বা কনের মামা বা নানা

যদি স্বেচ্ছায় কিছু সাহায্য করতে চায়, তাহলে সেটা যেন সেই কুপ্রথা অনুসারে না করে বরং আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা যে রসুলের সুন্নাত, সেভাবে যেন করে। এজন্য কাপড়ের পরিবর্তে নগদ কিছু টাকা দিতে পারে, যা ২০০/৩০০ শতের অধিক যেন না হয়। এ সাহায্যটাও যেন গোপনভাবে করা হয়, যাতে পরবর্তীতে কোন প্রথায় পরিণত না হতে পারে। বর-কনে বিবাহের আগে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, কনের হাতে মেহেদীও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তৈল দেয়ার অনুষ্ঠান, গোসল দেয়ার অনুষ্ঠান ও মেহেদী অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ করে দেয়া দরকার। কেননা এগুলোতে অনেক হারাম প্রথার প্রচলন হয়েছে এবং নিত্য নতুন হারাম প্রথা যোগ হচ্ছে।

যদি বিবাহ একই শহরে বা একই গ্রামে হয়, তাহলে যোহরের নামাযের পর যাত্রা শুরু করা উচিত। বরের ঘরে বরের আত্মীয় স্বজন একত্রিত হবে এবং কনের ঘরে কনের আত্মীয় স্বজন একত্রিত হবে। কনের সেখানে তখন নাতখানি, ওয়াজ বা দরূদ শরীফ পাঠের মজলিসের আয়োজন করা যেতে পারে। এদিকে বর সুন্নাত মত পোষাক পরে মাথায় বিবাহের পাগড়ী বেঁধে হেঁটে বা বাহন যোগে যাত্রা করবে। বর যাত্রীদের আগে আগে সুন্দর সুন্দর না'ত পাঠ করা যেতে পারে। কনের ঘরে বর যাত্রীদের জন্য যেন কোন খানা পিনার আয়োজন না করে। কেননা হযরত ফাতিমা যোহরার বিবাহে হুযুর আলাইহিস সালাম কোন খানাপিনার আয়োজন করেননি। কেবল চা পানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর যাত্রী পৌছার পর পরই আকদ হয়ে যাওয়া দরকার। যদি বিবাহ মসজিদে হয়, তাহলে খুবই ভাল। মসজিদে বিবাহ হওয়াটা মুস্তাহাব। কনের ঘরে হলেও কোন ক্ষতি নেই। আক্দ হওয়ার পর পর বর যাত্রী ফিরে আসবে। এসব কাজ যেন আসরের আগে সমাধা হয়ে যায়। মাগরিবের পর বধুকে যেন বিধায় করা হয়। ও সময় কুপ্রথা মতে কোন পয়সা ছিটানো উচিত নয়। অবশ্য বিবাহের সময় খোরমা ছিটানো সুন্নাত। বিবাহের সময় প্রচারের উদ্দেশ্য দু'চারটি বাজী ফোটানো যেতে পারে অথবা রমযান মাসে সেহেরীর সময় ঘুম থেকে উঠানোর জন্য যে রকম দফ বাজানো হয়, সে রকম দফও বাজানো জায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যৌতুক

যৌতুকেরও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া দরকার, যেটা ধনী গরীব সবাই দিতে পারে। ধনীরা নিজের মেয়েদেরকে অন্য সময় যা খুশী তা দিক, কিন্তু যৌতুকের ব্যাপারে যেন সীমা লঙঘন না করে। স্মরণ রাখবেন, যদি আপনি বরকে যৌতুক দিয়ে ঘর ভর্তি করে দেন, তাতেও আপনার কোন সুনাম হতে পারে না। কেননা কোন কোন জায়গায় ডোম-চামারেরা এতটুকু যৌতুক দেয়, যা বড় বড় মুসলমান ধনীরাও দিতে পারে না। যেমন কয়েক বছর আগে আগ্রায় এক চামার ওর মেয়ের বিয়েতে এতটুকু যৌতুক দিয়ে ছিল, যা নিয়ে যাবার সময় দীর্ঘ এক মাইল মিছিলের মত হয়ে ছিল এবং যা পাহারা দিবার জন্য পুলিশ তলব করা হয়েছিল। যখন মেয়ের বাপকে বলা হলো যে, এত মাল রাখার মত ঘর বরের কাছে নেই, তখন সাথে সাথে বরকে নতুন ঘর খরিদ করে দিয়েছিল। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে নামধামের জন্য জায়গা জমি বিক্রি করে মেয়ের বিয়েতে উল্লেখযোগ্য যৌতুক দিয়ে থাকে। কিন্তু চামারের যৌতুকের সামনে ওর কোন সুনাম হয় না। সুতরাং মুসলমান ভাই গণ! সজাগ হোন, সেই সুনামের লোভে নিজের ঘরে আগুন দিবেন না। স্মরণ রাখবেন, নাম ও সুনাম আল্লাহতাআলা ও তাঁর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং আমি নিম্নে যে যৌতুকের কথা উল্লেখ করতেছি, সেটার অধিক কখনও দিবেন না।

দু'টি বরতন, দু'টি গ্লাস, একটি লেফ, একটি তোশক, দু'টি বালিশ, একটি চাদর, কনেকে দু'টি শাড়ী, বরকে এক সেট কাপড়, একটি কুরআন শরীফ রেয়াল সহ, একটি জায়নামায এবং সম্ভব হলে যে কোন এক পদ অলংকার। আর পারলে ছেলের মাকে একখানা শাড়ী ও বাপকে একটি লুঙ্গি ও একটি পাঞ্জাবী দেয়া যায়। এর অতিরিক্ত কোন কিছু যেন দেয়া না হয়। অবশ্য বিবাহের পর মেয়ের বাপ ইচ্ছে করলে মেয়েকে নগদ টাকা বা মেয়ের নামে জায়গা জমি বা দোকানপাট ক্রয় করে দিতে পারে। তবে মেয়ে যদি একাধিক থাকে, সবাইকে সমান সমান দিতে হবে। অন্যথায় গুনাহের ভাগী হবে। যে সন্তানদেরকে সমান চোখে দেখে না, হাদীছ শরীফে ওকে জালিম বলা হয়েছে। নিজের মেয়েদেরকে শিখায়ে দিবেন যে শ্বাশুর বাড়ীতে শ্বাশুড়ী বা ননদরা যৌতুকের জন্য যদি ভর্ৎসনা করে, তখন যেন বলে যে আমি সুন্নাত তরীকা মতে এবং হযরত খাতুনে জান্নাত (রাদি আল্লাহু আন্হা) এর গোলামীতে তোমাদের ঘরে এসেছি। তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করলে, সেটা মূলতঃ ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভর্ৎসনা করা হবে। শ্বাশুড়ী ও ননদরাও স্মরণ রাখবেন, কনের এ উত্তর শুনার পরও যদি মুখ বন্ধ না হয়, তাহলে ঈমান হারা হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরজ করলো, আমি শপথ করেছি যে আমার মেয়েকে যৌতুক হিসেবে প্রত্যেক জিনিস দিব। এখন আমি কীভাবে আমার শপথ পূর্ণ করতে পারি, কেননা, প্রত্যেক জিনিস তো রাজা-বাদশার পক্ষেও দেয়া সম্ভব নয়। তিনি বললেন, আপনার মেয়েকে একখানা কুরআন শরীফ দিয়া দিন, এতে প্রত্যেক জিনিস আছে, যেমন- وَلَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

(শুক্না-ভিজা এমন কিছু বাদ নেই, যেটা কুরআন মজীদে উল্লেখিত নেই)

সুতরাং মেয়ে ও শ্বাশুরী-ননদের স্মরণ রাখা দরকার যে, কুরআন শরীফকে যৌতুক হিসেবে দেয়া হলে মনে করতে হবে যে সবকিছু দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় কোন জিনিস কুরআন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

যদি কনের বাড়ী অন্য শহরে হয় বা বরের বাড়ী থেকে দূরে হয়, তাহলে বরযাত্রীর জন্য খাবারের আয়োজন করবে মেহমানদারী হিসেবে। অবশ্য ২০/২৫ জনের অধিক যেন বরযাত্রী না হয়। পাড়া-পড়শীকে ব্যাপক ভাবে দাওয়াত দেয়ার যে প্রথা আছে, সেটা বন্ধ করে দিতে হবে। তবে বিবাহের কাজ কর্ম আঞ্জাম দেয়ার কাজে যারা নিয়োজিত থাকে ও দূর থেকে আগত মেহমানদেরকে নিশ্চয়ই খাওয়াতে হবে। মোট কথা হলো, মেয়ের বাপের উপর চাপ যত হালকা করা যায়, ততই মঙ্গল।

মেয়েকে বিদায় করার দ্বিতীয় দিন বরের বাড়ীতে ওলীমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। তবে সেটা বর পক্ষের সামর্থানুসারে সুন্নাত মুতাবিক হওয়া উচিত। জাঁকজমক সহকারে করার জন্য যেন সুদী কর্জ নেয়া না হয়। এ ওলীমা অনুষ্ঠানে কিছু গরীব মিসকীনকেও দাওয়াত দেয়া উচিত। স্মরণ রাখবেন, যে বিবাহে খরচ কম হবে, ইন্শা আল্লাহ সে বিবাহ খুবই মুবারক ও কনে বড় সুখী হবে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, অধিক যৌতুক আনয়নকারী মেয়েরা শ্বাশুর বাড়ীতে নানা কষ্টে থাকে এবং কম যৌতুক আনয়নকারীরা বড় আরামে জীবন অতিবাহিত করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জনগণের শিক্ষার জন্য হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রাদি আল্লাহ আনহা)-এর শাদী মুবারক, তাঁর যৌতুক ও তাঁর দাম্পত্য জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হযরত ফাতিমাতুয যোহরা

(রাদিআল্লাহু আনহা)

এর শাদী মুবারক।

হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহ আনহা) এর বিবাহের সময় বয়স হয়েছিল পনের। তখন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বয়স ছিল বাইশ বছর। হযরত আলীর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং হিজরী সনের দ্বিতীয় বছর ১৭ই রজব সোমবার বিবাহের দিন ধার্য করেন। সারা মদীনা শহরে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যেন ঐ দিন যোহরের সময় সবাই মসজিদে নববীতে আগমন করেন। এ সংবাদে সারা মদীনা শহর মুখরিত হয়ে উঠলো। নির্দিষ্ট দিনে যোহরের সময় মসজিদে নববী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এক পাশে হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহুমা) আর এক পাশে হযরত উসমান (রাদি আল্লাহ আনহু) বসলেন, চারিদিকে আনচার ও মুহাজের ঘিরে বসলেন এবং মাঝখানে হযরত আলীকে সামনে নিয়ে আমাদের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তশরীফ রাখলেন। তখন এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো, যেন আরশ জমীনে নেমে আসলো। যখন সমাবেশ ভরপুর হয়ে গেল, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে খোতবা পাঠ করলেন, অতঃপর ১৫০ ভরি চান্দি মোহরানা ঠিক করে হযরত আলীর সাথে খাতুনে জান্নাতের আক্দ পড়ায়ে দিলেন। এরপর খোরমা ছিটায়ে দিলেন। কোন খানাপিনার আয়োজন ছিল না। অতঃপর নব-দম্পতির জন্য বিশেষ দুআ করা হলো এবং প্রত্যেকে মুবারকবাদ দিলেন। ঘর থেকে বিদায়ের সময় মরহুমা মায়ের কথা স্মরণ করে যখন হযরত ফাতিমা কাঁদছিলেন, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মা তুমি কাঁদছো কেন, তুমিতো সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠা। তোমার বাপ হচ্ছে ইমামুল আম্বীয়া আর তোমার স্বামী হচ্ছে ইমামুল আওলিয়া। হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর শ্বাশুর বাড়ীতে যাওয়ার পরদিন এক দাওয়াতের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে দশ সের যবের রুটি, কিছু পনির

এবং যৎসামান্য খোরমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ দাওয়াতের নামই হচ্ছে ওলীমা এবং এ দাওয়াত হচ্ছে সুন্নাত। এ সুন্নাত রীতি মেনে চলা সবের উচিত এবং প্রচলিত যাবতীয় কু প্রথা বর্জন করা আবশ্যক।

হযরত ফাতিমাকে প্রদত্ত যৌতুক

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যাকে বিবাহের দিন যৌতুক হিসেবে একটি চাদর, একটি চামড়ার তোশক, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি বালিশ ও একটি লেপ, একটি আটা পিষার চাক্কি, পানির জন্য একটি মোশক, একটি কাঠের পেয়ালা, এক জোড়া রুপার চুড়ি, গলায় পড়ার জন্য একটি হাতির দাঁতের হার ও এক জোড়া খড়ম দিয়েছিলেন।

শাহজাদীর সাংসারিক জিন্দেগী

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) স্বামীর ঘরের আসার পর ঘরের সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়লো। সব কাজ নিজেকে করতে হতো বিধায় কাপড় চোপড় মলিন হয়ে হয়ে যেতো এবং হাতে চাক্কির দাগ পড়েছিল। একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) খবর দিলেন যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ বন্দী বন্টন করতেছেন। যদি সেখান থেকে আমরা একটা বাঁদী পেতাম, তোমার কষ্ট অনেক লাঘব হতো। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন, তখন নবীজী ঘরে ছিলেন না, মাকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে আসলেন। নবীজী ঘরে আসলে, হযরত ছিদ্দিকা (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর আগমনের কথা শুনালেন এবং যা বলে গেছেন সব জানালেন। রাত্রে নবীজী মোহরার ঘরে গেলেন এবং ফরমালেন, হে কলিজার টুকরা, তোমার কষ্টের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু যুদ্ধ বন্দী নর-নারীগুলো সেসব এয়াতীমদের জন্য, যাদের বাপ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে। তুমিতো আমার ছায়াতলে আছ। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো। আমি তোমাকে এমন এক তসবীহের কথা বলছি, যেটা নিয়মিত পড়লে বাঁদী গোলামের কথা ভুলে যাবে। সেটা হলো প্রথমে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এরপর ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ', অতঃপর ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে, যেন সর্বমোট একশ বার হয়। এভাবে সকাল বিকাল পড়তে থেকো। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) দারুণ খুশী হয়ে গেলেন এবং এ আমলের ফলে জীবনে

আর কোনদিন গোলাম-বাঁদীর অভাব বোধ করেননি। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর অনুকরণে যারা এ আমল করবে, ইনশা আল্লাহ তারাও কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে না।

উপদেশ

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় বনিবনা হয় না, যার কারণে স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখতে চায় না এবং স্ত্রীও স্বামীর নাম শুনলে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। এজন্য কোন সময় স্ত্রী দোষী হয়ে থাকে আবার কোন সময় স্বামীও। কিন্তু পুরুষতো অন্য একটি বিবাহ করে দিব্যি আরামে জীবন অতিবাহিত করে কিন্তু বেচারী মহিলার জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে বরং ওর গোটা পরিবারের জীবনে অশান্তি নেমে আসে। এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। কোন সময় স্বামী লাপাত্তা বা পাগল হয়ে যায়। তখনও মহিলার দুঃখের সীমা থাকে না। মহিলাদের এ রকম অসহায় অবস্থা দেখে বিধর্মীরা মুসলমানদের প্রতি নানা অপবাদ দেয় এবং বলে বেড়ায় যে ইসলাম মেয়েদের প্রতি জুলুম করেছে এবং পুরুষদেরকে সীমাহীন আজাদী দিয়েছে। এ অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের অনেক মহিলারা ধর্মচ্যুত হওয়াকে তাদের জন্য সহায়ক মনে করে। তারা স্বামী থেকে তালাক নেয়ার জন্য ধর্মচ্যুত হয়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অন্যের ঘরে চলে যায়। এ ধরনের প্রতিকার মারাত্মক ক্ষতিকর ও ভ্রান্তও। কেননা এতে মুসলমান জাতির বদনাম হয় এবং অনেক মহিলা পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে না। তাছাড়া ধর্মচ্যুত হওয়ার দ্বারা প্রথম বিবাহ ভঙ্গও হয় না।

অনেক জাতীয় নেতা এর প্রতিকার স্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সেটাও ভুল। কেননা শরীয়ত মতে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হয় না। একমাত্র স্বামী তালাক দিলেই বিবাহ ভঙ্গ হতে পারে।

অনেক বুদ্ধিজীবীরা এটা চিন্তা ভাবনা করেছেন যে মোটা অংকের মোহরানা নির্ধারণ করা হলে বা মহিলার নামে স্বামীর পক্ষ থেকে জায়গা জমি বা দোকানপাট লিখায়ে নিলে এর প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু সেটাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা মোটা অংকের মোহর আদায় করা মহিলাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। অনেক সময় এর জন্য মামলা মোকাদ্দমাও হয়ে থাকে কিন্তু বর পক্ষের

মিথ্যা সাক্ষী ও মিথ্যা দাবীর দ্বারা মামলা খারিজ হয়ে যায়। জায়গা-জমি ও ভরণপোষণের কথা যেটা লিখায়ে নেয়া হয়, সেটাও আদায় করাট অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল হয়ে পড়ে। আর আদায় করতে পারলেও যৌবনটা কিভাবে অতিবাহিত করবে? বন্ধুগণ, এ সমস্ত চিন্তাধারা সবই ভুল। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে বিবাহরে সময় কাবীন নামায় স্বামীর দ্বারা এটা যেন লিখায়ে নেয়া হয় যে 'যদি আমি লাপাত্তা হয়ে যাই বা এ স্ত্রীর বর্তমানে অন্য বিবাহ করে ওর প্রতি জুলুম করি বা ওর শরয়ী হকসমূহ আদায় না করি, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে ওকে পূর্ণ তালাক লওয়ার অধিকার দেয়া হল। এ মুচলেখাটা যেন ইজাব-কবুল হওয়ার পর করা হয়। অথবা কাজী যদি পুরুষ থেকে ইজাব গ্রহণ করে এবং মহিলা যদি এ শর্তে কবুল করে যে অমুক অমুক অবস্থায় আমার তালাক নেয়ার অধিকার থাকবে, তাহলে মহিলা প্রয়োজনে স্বামী থেকে তালাক নিতে পারবে। তখন ইনশা আল্লাহ স্বামী কোন অসদাচরণ করতে পারবে না। আর করলে স্ত্রী স্বয়ং তালাক নিয়ে স্বামী থেকে আজাদ হয়ে যেতে পারবে। এতে শরীয়তের কোন বাঁধা নেই এবং এটা খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুসলমানদের ঘর ভাঙ্গা উদ্দেশ্য নয় বরং যৌবনের দাপটে পুরুষদের অত্যাচার থেকে মহিলাদেরকে রক্ষা করাই কাম্য।

দ্বিতীয় উপদেশ

পাঞ্জাব ও কাটিয়াওয়ার্ডে তালাকের ঘটনা খুবই ব্যাপক। কথায় কথায় তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং হিন্দু কেরানীদের দ্বারা তালাক নামা লিখায়, যারা ইসলামী মাসায়েল সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। পরে হা-হুতাস করে মুফতী সাহেবানের কাছে ধর্ণা দেয় এবং কান্নাকাটি করে বলে যে, হুযূর, কোন একটা উপায় বের করুন যেন আমার স্ত্রীটা আমার আক্‌দে এসে যায়। আমি যেহেতু ফত্ওয়ার কাজ করি, সেহেতু এ ধরনের অনেক ঘটনা নিয়ে লোকেরা আমার কাছে আসে এবং বাহানা হিসেবে বলে থাকে যে, রাগের মাথায় তালাক দিয়েছে কিন্তু এটা কোন সহায়ক যুক্তি নয়। তালাকতো রাগের মাথায় দিয়ে থাকে, খুশীতে কেউতো তালাক দেয় না। আবার অনেকে ওহাবীদের থেকে এ রকম ফত্ওয়া নিয়ে আসে যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে নাকি এক তালাক পতিত হয় এবং পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ওহাবীদের ফত্ওয়া দ্বারা শরয়ী হুকুম বদলাতে পারে না। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমার ফত্ওয়ার কিতাব দেখুন) আমার পরামর্শ হচ্ছে তালাকের নাম কখনও মুখে নিবেন না। এটা খুবই

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারাপ বিষয়। যদি একান্ত অপারগ অবস্থায় তালাক দিতে হয়, তাহলে কেবল এক তালাক দিন, যেন পরে মনোভাব পরিবর্তন হলে পুনরায় যাতে গ্রহণ করতে পারেন এবং তালাকনামা কোন অভিজ্ঞ কেরানী বা কোন আলিম দ্বারা লিখাবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের পরবর্তী প্রথা সমূহ

বিবাহের পরও প্রত্যেক জায়গায় বিভিন্ন প্রথা পালিত হয়। তবে এ ব্যাপারে ইণ্ডিয়ার ইউ পি সবচে' অগ্রগামী। ওখানে বিবাহের পর তিন ধরনের প্রথা পালিত হয়। এক, বধু বিদায়ের পর দিন। বধুর বাড়ী থেকে ত্রিশ/চল্লিশ জন লোক বরের বাড়ীতে যায়। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। খাওয়ার পর জর্দা ভর্তি রক্ষিত থালায় কনের পক্ষের আগত লোকেরা সাধ্যমত টাকা পয়সা রাখে, যেটা বরপক্ষ উপঢৌকন হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর কনেকে ওদের সাথে নিয়ে আসে। এ অনুষ্ঠানকে ওদের ভাষায় চৌথী বলে। দুই, বিবাহের চতুর্থ দিন বরসহ নারী-পুরুষের একটি দল কনের বাড়ীতে যায়। তাদের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তরি-তরকারী যেমন আলু, শালগম, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি এবং কিছু মিষ্টি নিয়ে যায়। মিষ্টির মধ্যে লাড্ডু অবশ্যই থাকতে হয়। মেয়ের বাড়ীতে মেহমানদারীর জন্য বিশেষভাবে পায়েশ তৈরী করা হয়। একটি ভাঙ্গা চেয়ারের উপর এক প্লেট পায়েশ রেখে ওটাকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বরকে সেই চেয়ারে বসতে দেয়া হয়। বর অজান্তে সেই চেয়ারে বসলে সমস্ত কাপড়ে পায়েশ লেগে যায়। এরপর শুরু হয় রং তামাশার লীলাখেলা। যে যাকে পায়, পায়েশ নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে অর্ধদিবস অতিবাহিত হয়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। তখন বর কনেকে সামনা সামনি একটি খাটে বসানো হয়। অতঃপর বরের পক্ষ থেকে আনিত লাড্ডু বর কনের মধ্যে বিনিময় হয়। এভাবে সাতবার হওয়ার পর রং তামাশার তান্ডবলীলা শুরু হয়। তখন শয়তানও লেজ তুলে পালায়। বরের পক্ষ থেকে আনিত তরি-তরকারী দু'ভাগ করে একভাগ কন্যা পক্ষ, এক ভাগ বর পক্ষ নিয়ে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করে। এর সাথে রং নিক্ষেপনও চলে। তিন, যখন কনে পুনরায় শ্বাশুর বাড়ীতে যায়, তখন তৃতীয় ধরনের প্রথা পালিত হয়। একে কংগা খোলার অনুষ্ঠান বলা হয়। স্বামী-স্ত্রীকে এক জায়গায় বসানো হয়। বর নিজের মুষ্টি খুব শক্ত করে বন্ধ করে রাখে এবং কনেকে কন্‌গণ খুলতে বলা হয়। কনে আপ্রাণ চেষ্টা করে যখন কন্‌গণ

খুলে ফেলে, তখন জোরে তালি বাজায় এবং একে অপরের প্রতি পানি নিক্ষেপ করে। ধোঁকা দিয়ে কোন ভদ্রলোককে সেখানে এনে ভিজায়ে দিতে পারলে অধিক আনন্দবোধ করা হয়। বরের মাথার টোপরকে নিকটবর্তী কোন নদী-নালায় বা পুকুরে বা কোন অব্যবহৃত কূপে ফেলে দেয়া হয়। অবশ্য এ টোপর মহিলারা ফেলতে গেলে গান-বাজনা সহকারে যায়। আর পুরুষেরা গেলে নদী-পুকুরকে কেবল সালাম করে ফেলে দিয়ে আসে। অনেকে জর্দা ভাত পাকায়ে খাজা খিজিরের নামে ফাতিহাও দিয়ে থাকে।

এসব প্রথাগুলোর ক্ষতি সমূহ

উপরোক্ত সব প্রথা হিন্দুয়ানী। মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা, খাদ্যদ্রব্য ও তরিতরকারীর অপচয়, মুসলমানের কাপড় বিনষ্ট করা, একে অপরকে অনর্থক কষ্ট দেয়া, নদী ও পানিকে সালাম করা হারাম এবং মুশরিকদের কাজ। গান-বাজনাও হারাম। এসব প্রথা একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত। অনেক জায়গায় এটাও প্রচলিত আছে যে শ্বাশুর বাড়ীতে নববধুর প্রথম কাজ হয় পুরী তৈরী করা, যেটা পাড়া-পড়শী সবার মধ্যে বন্টন করা হয়। এটাও একটা ফালতু কাজ। যদি বরকতের উদ্দেশ্যে নববধূর হাতে প্রথম খাবার তৈরী করে হুযূর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহতাআলা আনহ) এর নামে ফাতিহা দেয়া হয়, তাহলে সেটা বরকত ও খুবই ভাল কাজ।

অতি জরুরী পরামর্শ

শ্বাশুর বাড়ীতে ঝগড়া বিবাদ কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে। কোন সময় নববধু কর্কশ ভাষী, বেআদব ও অহংকারী হয়ে থাকে, শ্বাশুরী-ননদের সাথে দুঃব্যবহার করে, স্বামীর জিনিসপত্রকে তুচ্ছ মনে করে, নিজের বাপের বাড়ীর বড়াই করে। কোন সময় শ্বাশুরী-ননদ নববধুর সামনে ওর মা-বাপের বদনামী করে, যা সে বরদাস্ত করতে পারে না। আবার কোন কোন নববধু শ্বশুর বাড়ীতে কাজ কর্ম করতে চায় না। কেননা বাপের বাড়ীতে কাজ করার অভ্যাস ছিল না। কোন কোন সময় বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্যও ঝগড়া হয় এবং এসব কথা বাপের বাড়ীতে গিয়ে বলে। এর ফলে অনেক সময় দু' পরিবারের মধ্যে মারাত্মক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। কোন সময় শ্বাশুরী-ননদ বিনা কারণে বধুর বদনামী করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনর্থক জ্বালাতন করে এবং অনেক সময় বলে যে, আমাদের ঘরের জিনিস চুরি করে বাপের বাড়ী নিয়ে যায়।

এসব অভিযোগের মূল কারণ হচ্ছে, একে অপরের হক সম্পর্কে অনবহিত। বধু জানে না যে ওর উপর স্বামী ও শ্বাশুরীর কি হক রয়েছে এবং শ্বাশুরী ও স্বামী জানে না যে ওদের উপর নববধুর কি হক রয়েছে। শ্বাশুরী ও স্বামীদের এটা খেয়াল রাখা দরকার যে নববধু এক প্রকার পাখীর মত, যেটাকে সবেমাত্র পিজরায় আবদ্ধ করা হয়েছে। এ রকম পাখী প্রথম প্রথম খুবই চটপট করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পালনকারী ওকে দানা পানি দিয়ে, আদর যত্ন করে মন বসাতে চেষ্টা করে। পরে আস্তে আস্তে মন বসে যায়। অনুরূপ শ্বাশুরী ননদ ও স্বামীদের এ রকম আচরণ করা উচিত যেন সহসা নববধুর মন বসে যায়। এটাও মনে রাখা দরকার যে মেয়ে সব কিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু মা-বাপ ও ভাই-বোনের বদনামী মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই ওর সামনে কখনো ওর মা-বাপের বদনামী করা ঠিক নয়। দেখুন, কুখ্যাত কাফির আবু জেহলের ছেলে আকরমা (রাদি আল্লাহু আনহ) যখন ঈমান আনলেন, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে সতর্ক করে দিলেন যে আকরমা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে কেউ যেন ওর পিতা আবু জেহলের বদনামী না করে (মুদায়েজুন নাবুয়াত)। এটা কেন? কেবল এ জন্য যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃতিগত ভাবে নিজের মা-বাপের বদনামী শুনতে পারে না। যদি নববধু কোন কাজকর্ম ভাল মতে না জানে, ওকে আস্তে আস্তে শিখানো দরকার। মোট কথা, ওর সাথে এমন আচরণ করা দরকার যেমন নিজের মেয়েদের সাথে করা হয়। কারো প্রতি বিনা কারণে খারাপ ধারণা হারাম। এ রকম ধারণার ফলে অনেক ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে।

নববধূদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, মিষ্ট কথার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়। নমনীয় ব্যবহারের দ্বারা মানুষ পশুকে করায়াত্ত করে ফেলে। এ শ্বাশুরী ননদওতো মানুষ। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা ধরার জন্য দু'টি হাত, চলার জন্য দু'টি পা, দেখার জন্য দু'টি চোখ, শুনার জন্য দু'টি কান দিয়েছেন, কিন্তু বলার জন্য মাত্র একটি মুখ দিয়েছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, কথা কম বলুন, কাজ বেশী করুন। নিজের মুখে নিজের মা-বাপের বড়াই করা কোন বাহাদুরী নয় বরং নিজের কাজ কর্ম, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদির দ্বারা শ্বাশুরী-ননদ, স্বামী ও অন্যান্যদের কাছে মা-বাপের সুনাম হওয়াটাই হচ্ছে আসল বাহাদুরী। শ্বশুর বাড়ীতে অনেক ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে।

এসব কখনো মা-বাপকে অবহিত করতে নেই। প্রথম প্রথম ননদ-শ্বাশুরীদের আচরণ মনঃপুত না হলেও ধৈর্যধারণ করা উচিত। কিছুদিন পর সবাই বধুর অনুসারী হয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমি এমন অনেক মেয়েকে দেখেছি, যারা শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম প্রথম নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু নিজের চারিত্রিকগুনে শ্বশুর বাড়ীর সবাইকে এমন কাবু করে ফেলেছে যে কিছুদিনের মধ্যে নববধু সবকিছুর জিম্মাদার হয়ে গেছে।

স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ-রসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করা জায়েয হতো, তাহলে আমি মহিলাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে নিজেদের স্বামীদেরকে যেন সিজদা করে। স্বামীদেরও এটা স্মরণ রাখা দরকার যে পৃথিবীতে মানুষের চার রকমের পিতা থাকে-এক জন্মদাতা, দুই শ্বাশুর, তিন উস্তাদ, চার-পীর। নিজের শ্বাশুরকে মন্দ বলা মানে নিজের বাপকে মন্দ বলা। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন, সফলকাম ব্যক্তি সে, যার স্ত্রী-সন্তান ওর প্রতি সন্তুষ্ট। মনে রেখো, তোমার স্ত্রী একমাত্র তোমার জন্য নিজ পরিবারের সবাইকে ত্যাগ করেছে এবং কোন কোন সময় তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করে প্রবাসিনী হয়েছে। তাই, তুমি ওর প্রতি অবিচার করলে সে কার হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে? তোমার উপর মা-বাপ ভাই-বোন সবের হক রয়েছে। কারো হক আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা কর না। দুনিয়া থেকে বিদায় হবার সময় বান্দার হক যেন কাঁধে না থাকে। আমরাতো আল্লাহর গুনাহগার আছি। কিন্তু বান্দার গুনাহগার যেন না হই। হে আল্লাহ! আমার এসব ছোটখাট কথার মধ্যে তাছীর দান করুন, মুসলমান পরিবার সমূহের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিন।

আরও দু'টি কথা স্মরণ রাখবেন, একঃ আপনারা আপনাদের মা-বাপের সাথে যে রকম আচরণ করবেন, সে রকম আপনাদের ছেলেরা আপনাদের সাথে আচরণ করবে। অন্যের ছেলেমেয়েদের সাথে আপনারা যে রকম আচরণ করবে, সে রকম অন্যরাও আপনাদের ছেলেমেয়েদের সাথে করবেন। আপনি যদি আপনার শ্বশুর-শ্বাশুরীকে গালি দেন, আপনার জামাতাও আপনাকে গালি দিবে।

দুইঃ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিকট আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করার দ্বারা হায়াত ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের উচিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জিন্দেগী সম্পর্কে জানার জন্য যেন তাঁর জীবনী গ্রন্থ পাঠ করে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে তাঁর আচরণের কথা অবহিত হয়ে তা যেন নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম অধ্যায়

মুহররম, শবে বরাত, ঈদ ও কুরবানীর কুপ্রথা সমূহ

মুহররম মাসের প্রথম দশ দিন বিশেষ করে দশম দিন অর্থাৎ আশুরার দিনকে খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসবের দিন মনে করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাজীয়া বের করা হয় এবং মুসলমানের ছেলেরা কুকুর, গাধা, বানর ইত্যাদির মুখোশ পরে তাজীয়ার আগে আগে গমন করে। রাস্তাঘাটকে রং বেরং এর পতাকা দ্বারা সাজানো হয় এবং শরাব পান করে চৌরাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে মাতমের নামে লাফালাফি করে। ইউ, পিতে মুসলমানেরা এ দশ দিন রাফেজীদের মাহফিলে শোক গাঁথা শুনার জন্য ও মিষ্টির প্যাকেট নেয়ার জন্য গমন করে। আট তারিখ মুহররমের পতাকা উত্তোলন করে, নয় তারিখ তাজিয়া নিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে এবং দশ তারিখ তাজীয়ার মিছিল নিজেরাও বের করে এবং রাফেজীদের মিছিলেও যোগদান করে। অনেক মুর্খ লোক ওদের সাথে মাতমও করে। অতঃপর মহররমের বার তারিখ তাজীয়ার কুলখানি এবং সফর মাসের বিশ তারিখ চেহলাম পালন করে। তখনও কয়েক রকম মিছিল বের করা হয়। সফর মাসের শেষ বুধবার মুসলমানদের ঘরে পুরী তৈরী করা হয় ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের কতেক জায়গায় কলা পাতা বা কাঁঠাল পাতায় মসজিদের ইমামদের দ্বারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখায়ে ওটাকে পানিতে চুবায়ে সেই পানি দ্বারা গোসল করাকে বড় ছওয়াবের কাজ মনে করে। কাটিয়াওয়ার্ডে ওদিন লোকেরা আসরের নামাযের পর ছওয়াবের নিয়তে জঙ্গলে ভ্রমণে বের হয় এবং ইউ,পির কয়েক জায়গায় ওদিন ঘরের পুরানো মাটির বরতন ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলে এবং নতুন ক্রয় করে। এসব কাজ এজন্য করা হয় যে মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে সফরের শেষ বুধবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরোগ্য হয়ে গোসল করেন এবং মনের উৎফুল্লতার জন্য মদীনা শরীফের বাইরে ভ্রমণে গিয়ে ছিলেন। শবে বরাতে অর্থাৎ শাবানের পনের তারিখে মুসলমানের ছেলেরা এত আতশবাজী ফোটায় যে তখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাও মুশকিল হয়ে পড়ে এবং অনেক জায়গায় এর থেকে আগুনও লেগে যায়।

ঈদ ও কুরবানীর দিন ঈদের নামাযের পর সারাদিন খেলাধুলায় অতিবাহিত করে। শহরের সিনেমা হলগুলোতে অতিরিক্ত শো প্রদর্শিত হয়। সিনেমা হলের মালিকেরা রং বেরং এর পোস্টার ছাপায় এবং এতে লিখা থাকে 'পবিত্র ঈদ উপলক্ষে অমুক ছবির শুভ মুক্তি'। অনেক জায়গায় লটারী, নৌকা বাইচ ইত্যাদিরও আয়োজন করে থাকে। আমাদের এলাকায়, বিবাহের প্রথম বছর স্বামীকে অবশ্যই শ্বশুর বাড়ীতে ঈদ উদযাপন করতে হয় এবং যেসব মেয়ের জোড়া গাঁথা হয়েছে, ঈদের সময় বর পক্ষ থেকে অবশ্যই কাপড় চোপড় এবং কুরবানীর সময় কমপক্ষে একটি ছাগল পাঠাতে হয়।

এসব প্রথা সমূহের কুফল সমূহ

মুহররম মাস একান্ত পবিত্র মাস। বিশেষ করে আশুরার দিন অর্থাৎ দশই মুহররম খুবই পবিত্র। দশই মুহররম জুমাবারে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কিশতী থেকে স্থল ভূমিতে অবতরণ করেন। এ তারিখে ও এ দিনে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউন থেকে মুক্তি পান এবং ফেরাউন নদীতে ডুবে মারা যায়, এ তারিখ ও এ দিনে সায়্যেদুশ শোহদা ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে শাহাদত বরণ করেন। সম্ভবতঃ এ ১০ই মুহররমের জুমাবারে কিয়ামত সংঘটিত হবে। মোট কথা জুমাবার ও দশই মুহররম খুবই পবিত্র দিন। ইসলামে সর্বপ্রথম আশুরার রোয়া ফরয হয়েছিল। অতঃপর রমযান শরীফের রোযা ফরয হওয়ার পর সেটার ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায় কিন্তু সুন্নাত হিসেবে এখনও বলবৎ আছে। সুতরাং মুহররমের এ দিনসমূহে নেক কাজের ছওয়াব যেমন অধিক, তেমন গুনাহ করার আযাবও অধিক। তাজীয়া বের করা, আনন্দ মিছিল করা, লাফালাফি করা ইত্যাদি কাজ মূলতঃ ইয়াজীদ বাহিনীই করেছিল। এরা হযরত ইমাম হোসাইন ও অন্যান্য শহীদের মস্তক মুবারকসমূহ বর্শার অগ্রভাগে নিয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশপূর্বক কারবালা থেকে কুফা এবং কুফা থেকে দামস্কে ইয়াজীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আহলে বায়তের সদস্যরা তাজীয়া মিছিল, মাতম ইত্যাদি কোন দিন করেননি। সুতরাং এ মুবারক দিনসমূহে এসব কাজ করা মুসলমানদের জন্য কখনো উচিত নয়। এসব কাজ থেকে নিজেরাও বিরত থাকা উচিত এবং ছেলেপিলে ও আত্মীয় স্বজনকেও বিরত রাখা উচিত। আর রাফেজীদের মাহফিলে কখনও যোগদান করতে নেই। বরং পারলে নিজেরাই মাহফিল আয়োজন করবে এবং শাহাদতের সঠিক ঘটনা বর্ণনা করবে। সফর মাসের আখেরী বুধবার সম্পর্কে যে রেওয়ায়েতটি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐদিন নাকি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরোগ্যের গোসল করেছিলেন, সেটা নিছক ভুল মাত্র। সঠিক রেওয়ায়েত হচ্ছে সফরের সাতাশ তারিখ রোগাক্রান্ত হন অর্থাৎ জ্বর ও মাথার ব্যথা শুরু হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পর্দার অন্তরালে চলে যান। মাঝখানে কোন আরোগ্য লাভ করেননি। কুরআনখানি, ফাতিহা যখনই করা হোক না কেন, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঘরের ঘটিবাটি ভেঙ্গে ফেলা সম্পদের অপচয় হেতু হারাম। রবিউল আওয়াল মাসে সাধারণ মুসলমানেরা যে মিলাদ মাহফিল সমূহের আয়োজন করে, রাস্তাঘাট সাজায় এবং জুলুস বের করে, সেগুলো খুবই বরকতময় ও ফযীলতময়। রবিউসসানির গেয়ারবী শরীফের মাহফিলও খুবই ফযীলতময়। তফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে, মাহফিলে মীলাদ শরীফের বরকত বছরব্যাপী থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আমার **জা'আল হক** দেখুন। ওসব মাহফিলসমূহে মুসলমানদেরকে নছীহত করার সুযোগ হয়; মুসলমানদের মধ্যে হুযুরের মহব্বত সৃষ্টি হয়, যেটা ঈমানের ভিত্তি। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব হুযুরের জন্ম সংবাদের আনন্দে স্বীয় বাঁদী ছুফিয়াকে মুক্ত করে দিয়ে ছিল। ওর মৃত্যুর পর কোন একজন ওকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, খুবই খারাপ, তবে সোমবারে আজাব কিছুটা লাঘব হয়। কেননা, আমি সেই দিন আমার ভাতিজার জন্ম সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছিলাম। যখন আবু লাহাবের মত কট্টর কাফির হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম হওয়ার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করায় কিছু না কিছু উপকৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রে মুসলমানেরা আনন্দ প্রকাশ করলে কেন ছওয়াব পাবে না, নিশ্চয়ই ছওয়াব পাবে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে এসব মাহফিলে যুবতী মহিলাদের নাত পাঠ ও পর পুরুষের কানে ওদের আওয়াজ পৌছা হারাম। যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করে মদীনা মনোয়ারার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলেন, তখন মদীনার আবাল বৃদ্ধ বণিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নারায়ে তকবীর ও নারায়ে রেসালতের শ্লোগানে হাট-বাজার, রাস্তাঘাট চারিদিক মুখরিত করে তুলেছিল এবং বিরাট জুলুস বের করে ছিল (মুসলিম)। বর্তমানকালে বারই রবিউল আওয়াল উপলক্ষে আমাদের দেশে সুন্নী মুসলমানেরা যে জশনে জুলুস বের করে থাকে ও মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকে, এতেও অনেক বরকত ও উপকার রয়েছে। এসব মাহফিল দ্বারা অনেক অমুসলিমরাও উপকৃত হয়ে থাকে।

ইউ,পিতে রজব মাসের ২২ তারিখে নতুন পাত্র ক্রয় করে সোয়া পোয়া ময়দা, সোয়া পোয়া চিনি এবং সোয়া পোয়া ঘি দ্বারা পুরি তৈরী করে হযরত জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ফাতিহা দিয়ে থাকে। এ প্রথার সাথে দু'টি নতুন প্রথা যোগ হয়েছে। একটি হচ্ছে ফাতিহার আগে লাকড়ী ওয়ালার কাহিনী পাঠ করা না হলে ফাতিহা শুদ্ধ হয় না। অপরটি হচ্ছে ফাতিহার জন্য তৈরীকৃত পুরি ঘরের বাইরে নেয়া যায় না এবং নতুন পাত্র ছাড়া এ ফাতিহা হতে পারে না। এসব ধারণা ভ্রান্ত। ফাতিহার জন্য নতুন পাত্রের শর্তারোপের প্রয়োজন নেই। অবশ্য অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য নতুন পাত্র সংগ্রহ করলে কোন ক্ষতি নেই। অন্যান্য ফাতিহার খাদ্য দ্রব্যাদির মত এ ফাতিহার দ্রব্যাদিও বাইরে নেয়া যায়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেরাজ উপলক্ষে নাত খানি, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা ছওয়াবের কাজ। কিন্তু ওসব মাহফিলে উচ্চস্বরে মহিলাদের নাত পাঠ হারাম।

শবে বরাতের রাত খুবই মুবারক রাত। এ রাতে সারা বছরের ব্যবস্থাপনা ফিরিশতাগণের উপর অর্পণ করা হয়। এ রাতেই নির্ধারিত হয় যে এ বছর অমুক অমুক মারা যাবে, অমুক অমুক জায়গায় এতটুকু পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে, অমুককে ধনী এবং অমুককে গরীব করা হবে। যে এ রাত ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে, সে আল্লাহর অনেক আজাব থেকে রেহাই পায়। এজন্য এ রাতের নামকরণ করা হয়েছে শবে বরাত। আরবী ভাষায় বরাত অর্থ রেহাই, মুক্তি। অর্থাৎ এ রাত মুক্তির রাত। কুরআন শরীফে বর্নিত আছে -

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

(কদর রাত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়) এ রাতে যমযম কূপের পানি বৃদ্ধি পায়, এ রাতে আল্লাহ তাআলার রহমত অধিক অবতীর্ণ হয়। (তফসীরে রূহুল বয়ান, সুরা দুখান) এ রাত গুনাহে লিপ্ত থাকা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। আতশবাজী সম্পর্কে এটা প্রসিদ্ধ আছে যে এটা মূলতঃ নমরূদ বাদশার আবিষ্কার। যখন সে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো, তখন ওর লোকেরা অগ্নি উৎপাদক বস্তুতে আগুন লাগিয়ে হযরত খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল। হিন্দুস্তানে হিন্দুরা হুলি ও দেওয়ালীর সময় আতশবাজী পোড়ায়। মুসলমানেরা এ কুপ্রথা হিন্দুদের থেকে শিখেছে। কিন্তু আফসোস, বর্তমান হিন্দুরা সেটা প্রায় ত্যাগ করেছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানেরা প্রতি বছর লাখ লাখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

টাকা এ আতশবাজীতে ব্যয় করে। প্রতি বছর খবর পাওয়া যায় যে অমুক জায়গায় এত ঘর বাড়ী আতশবাজীর আগুনে জ্বলে গেছে এবং এত লোক মারা গেছে। তাই এ কাজটা একেতঃ জানমালের ক্ষতি, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহতাআলার নাফরমানীও। আল্লাহর ওয়াস্তে এ বেহুদা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। আপনার ছেলে ও প্রতিবেশীদেরকে এ কাজে বাঁধা দিন। যেখানে বাজী পোড়ানো হয়, সেখানে তামাশা দেখার জন্যও যাবেন না। আতশবাজী তৈরী করা, বিক্রি করা, ক্রয় করা, পোড়ানো সবই হারাম।

উপরোক্ত দিনগুলোতে পালনীয় ইসলামী রীতি সমূহ

উপরোক্ত মাস সমূহে কি করণীয়, ইনশা আল্লাহ আমি এ কিতাবের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করবো, তবে কয়েকটি জরুরী বিষয় এখানে আলোচনা করছি। মুহররমের দশ তারিখ খিচুড়ী রান্না করা খুবই ভাল। কেননা, যখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এ দিন কিশ্‌তী থেকে স্থলভূমিতে অবতরণ করেন, তখন খাদ্যশস্যের ষ্টক শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিশতীর আরোহীদের মধ্যে যার কাছে যা ছিল, সব মিলায়ে রান্না করা হয়েছিল। (তফসীরে রূহুল বয়ান ১২ পারা, নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী সম্বলিত আয়াত দ্রষ্টব্য)। হাদীছ শরীফেও বর্ণিত আছে, যে আশুরার দিন ভাল খাবারের আয়োজন করে অর্থাৎ উন্নত খাবার তৈরী করে এবং সবাইকে খাওয়ায়, সে ভাগ্যবান, সারা বছর ওর ঘরে বরকত থাকবে (শামী)। খিছুরীতে যেহেতু সব রকমের শস্য দানা থাকে, সেহেতু আশা করা যায় যে সারা বছর প্রত্যেক খাবারে বরকত হবে। ওদিন দান-সদকা করাও খুবই ভাল। নিজের ঘরে বা মহল্লায় শাহাদতে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর স্মরণে মাহফিলের আয়োজন করাও পূণ্যময় কাজ। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনায় কান্না আসলে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মাতম করা, নিজের মুখে হাত মেরে শোক প্রকাশ করা হারাম। রাফেজীদের মাহফিলে কখনো যাওয়া উচিত নয়। কেননা ওদের মাহফিলে অধিকাংশ বক্তব্য বিদ্বেষমূলক হয়ে থাকে এবং সাহাবায়ে কিরামকে গালিগালাজ করে।

রবিউল আওয়াল মাসে মাসব্যাপী যখনই ইচ্ছে নাত মাহফিল, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি করা যায়। নাত মাহফিল করার সময় এটা স্মরণ রাখা দরকার যে নাত পাঠকারী পুরুষ অথবা ছোট মেয়ে হওয়া চায়। যুবতী মহিলারা ইচ্ছে

করলে ঘরোয়াভাবে মেয়েদের মজলিসে নাত পরিবেশন করতে পারে। মিলাদ মাহফিলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সীরাত বর্ণনার সাথে সাথে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, পর্দা ইত্যাদির আহকামও বর্ণনা করা যেতে পারে, যেন হুযূরের জীবনী বর্ণনার সাথে সাথে ইসলামের তবলীগও হয়ে যায়। বারই রবিউল আওয়াল, শরীয়ত সম্মতঃ যত রকম আনন্দ প্রকাশ করা যায় করুন, এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আবির্ভাব আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং আল্লাহর রহমতের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহর নির্দেশ। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত আছে-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

(হে মাহবুব, আপনি বলে দিন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও দয়ায় ওদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত) তবে আনন্দে দুঃখে, বিবাহ শাদীতে, রোগে শোকে সর্বাস্থায় মীলাদ শরীফের আয়োজন করা যেতে পারে। কেননা,

ان کے نثارکوئی کیسے ہی رنج مین ہو
جب یاد آگئے ہین سب غم بھلا دیئے ہین

অর্থাৎ মানুষ যত দুঃখ কষ্টে থাকুক না, যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবদানের কথা আলোচিত হয়, তখন সব দুঃখ-কষ্ট বিদূরীত হয়ে যায়।

রজব মাসের ২২ তারিখ হালুয়া-রুটি তৈরী করে হযরত জাফর সাদেকের নামে ফাতিহা দেয়া ভাল কাজ ও বরকতময়। কিন্তু ফাতিহার জিনিস ঘরের বাইরে না নেয়া, ফাতিহার আগে লাকড়ী ওয়ালার কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদি কুপ্রথাগুলো বর্জনীয়।

শবে বরাতে সারা রাত জেগে নফল ইবাদত করা খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া ঐ রাতে কবর যিয়ারত করা ও হালুয়া-রুটি তৈরী করে ফাতিহা দিয়ে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করাও বড় ছওয়াবের কাজ। এ রাত প্রসঙ্গে কিতাবের শেষে আরও অনেক বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

রমযান মাসে যে কেউ কোন কারণে রোযা না রাখলে, কারো সামনে সে যেন কোন কিছু পানাহার না করে। চারটি কারণে রোযা না রাখা যায়-এগুলো হচ্ছে মহিলাদের হাফেজ, নিফাস, এমন রোগ, যেটায় রোযা ক্ষতিকর এবং সফরকালীন সময়। কিন্তু পরে অবশ্যই কাযা আদায় করতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধিকাংশ মনীষীদের মতে ২৭শে রমযানের রাত হচ্ছে শবে কদর। এ রাত কুরআন তিলাওয়াত ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। সারা রাত জেগে থাকুন। তা না পারলে সেহরীর পর থেকে জেগে থাকুন। রমযান মাসে প্রত্যেক নেক কাজের ছওয়াব সত্তর গুণ পাওয়া যায়। তাই সারা রমযান মাস কুরআন তিলাওয়াত, নফল ইবাদত, দান খয়রাত ইত্যাদি নেক কাজে অতিবাহিত করুন। ঈদের দিন ভাল কাপড় পরা, গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো একে অপরকে ঈদ মুবারক দেয়া সুন্নাত। যদি কারো কাছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ থাকে অথবা সে পরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক মালামাল থাকে এবং কোন কর্জ ইত্যাদি না থাকে, তাহলে নিজের ও ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। ফিতরা রমযানের মধ্যে বা ঈদের দিন ঈদের নামাযের আগে দিয়ে দেয়া উত্তম। একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে ১৭৫ টাকার আট আনি ওজনের সমপরিমাণ গম বা এর দু'গুণ যব অথবা যেকোন একটার মূল্য। ঈদের দিন খোরমা খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া, রাস্তায় নিম্নস্বরে তকবীর বলা এবং এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও আর এক রাস্তা দিয়ে আসা সুন্নাত।

কুরবানীর দিনও গোসল করা, ভাল কাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। কিন্তু কুরবানীর দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং উচ্চস্বরে তকবীর বলা সুন্নাত। একটু আগে ফিতরার ব্যাপারে উল্লেখিত পরিমাণ চান্দি বা স্বর্ণ বা সম্পদ থাকলে কুরবানী দিতে হয়। স্মরণ রাখবেন, বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষেধ- ঈদের দিন, কুরবানীর দিন ও এর পরের তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্ব। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য **বাহারে শরীয়ত** দেখুন। উভয় ঈদ উপলক্ষে যাবতীয় অপচয় বন্ধ করুন। এ অপচয়ের টাকাগুলো গরীব আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, এয়াতীমখানা ও দীনি মাদ্রাসায় দান করুন। মনে রাখবেন, মুসলিম জাতির জন্য ঈদের আনন্দ তখনই সার্থক হবে, যখন সমগ্র জাতির মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্যভাব বিরাজ করবে। আমাদের দেশে ঈদের দিন সিনেমা ইত্যাদিতে যে টাকাগুলো অপচয় করা হয়, সে টাকা দিয়ে অনেক গরীব লোকের সাহায্য করা যায়। ঈদের দিন নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে নতুন নতুন কাপড় পরালেন কিন্তু গরীব মুসলমানের ছেলেমেয়েরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে রাস্তার দ্বারে বসে রইলো, এটা সত্যিকার অর্থে জাতীয় ঈদ হলো না। আল্লাহতাআলা মুসলিম জাতিকে সত্যিকার ঈদ নছীব করুক। আমীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক ফ্যাশন ও পর্দা

আধুনিক শিক্ষাভিমানী লোকেরা বর্তমান মুসলমানদের অধঃপতন ও অন্যান্য দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ এটাই মনে করে যে পশ্চিমা রীতিনীতি গ্রহণপূর্বক নিজেদেরকে ইংরাজদের মত গড়ে তুলতে হবে। পুরুষেরা যেন ক্লিনসেভ করে, গোঁফ লম্বা করে, ইংরাজদের মত কোট,পেন্ট, টাই, হ্যাট ইত্যাদি পরিধান করে এবং নামায রোযা ইত্যাদি বর্জন করে। মেয়েদেরকে যেন ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা না হয়, ওদেরকে যেন বেপর্দায় অবাধ চলাফেরার সুযোগ দেয়া হয়। চিত্ত-বিনোদনের জন্য স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে যেন বিপণি কেন্দ্র, পার্ক, সমুদ্র সৈকত, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি স্থানে গমন করে। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েরা যেন এক সাথে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করে।

এসব উদ্ভট চিন্তা ধারার ভূত ও সব আধুনিক চিন্তাবিদদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে এসবের বিপরীতে কেউ কিছু বললে ওদেরকে অজ্ঞ, কাঠমোল্লা, পুরান টাইপের লোক ইত্যাদি বলে ধিক্কার দেয়। পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকায় পর্দার বিরুদ্ধে প্রায় সময় লেখালেখি করে এবং অনেক সময় অপব্যাখ্যা করে কুরআন হাদীছকে পর্দার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করে।

আমার কিছুতেই বুঝে আসে না যে ওসব বিজাতীয় রীতিনীতি দ্বারা মুসলমান জাতির উন্নতি কিভাবে হতে পারে। যে সব সাহেবরা নিজেদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজেদের পরিবারকে আধুনিক ধাঁচে গড়ে তুলেছে, ওরা মুসলমান জাতির জন্য কি কল্যাণ বয়ে এনেছে?

আমি এ অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। ১ম পরিচ্ছেদে আধুনিক ফ্যাশনের কুফল এবং ২য় পরিচ্ছেদে পর্দা প্রথার উপকার এবং বেপর্দার কুফল বর্ণনা করেছি। আল্লাহতাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে এ বক্তব্য যেন কবুল করেন এবং মুসলমানদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধুনিক ফ্যাশনের কুফল

কুরআন মজীদে বর্ণিত আছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

(হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও) আল্লাহতাআলা মানুষকে দু'ধরনের অঙ্গ দিয়েছেন-একটি হচ্ছে বাহ্যিক, অপরটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ। আকৃতি, চেহারা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি হচ্ছে বাহ্যিক অঙ্গ এবং অন্তর, মেধা, আত্মা ইত্যাদি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। একজন মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমানদার তখনই হতে পারে, যখন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানিত্ব প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যার আকৃতি ও চরিত্রের মধ্যে ইসলামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং অন্তরে আল্লাহতাআলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্যের জজ্‌বা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঈমানের বাতি প্রজ্জ্বলিত হয় আর বাহ্যিক বেশভূষা এমন হয়, যা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পছন্দ ছিল। যদি অন্তরে ঈমান আছে কিন্তু বাহ্যিক বেশভূষা ভগবান দাসের মত, তাহলে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করলো না। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ভাবে মুসলমান হতে হবে। মনোযোগ সহকারে শুনুন, একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মগীরা ইবনে শায়বা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর গোঁফ কিছুটা লম্বা হয়ে গিয়েছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, হে মগীরা, তোমার গোঁফ লম্বা হয়ে গেছে, কেটে ফেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে ঘরে গিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবেন। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন-আমার মিসওয়াকটা নাও, এটার উপর গোঁফের বাড়তি অংশটা রেখে চাকু দ্বারা কেটে ফেল। অর্থাৎ ঘরে গিয়ে কাঁচি দ্বারা কাটার সেই অবকাশটাও দিলেন না, এক্ষুনি এখানে কেটে ফেল। এতে বুঝা গেল, লম্বা গোঁফ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপছন্দ ছিল। এ পৃথিবীতে হাজার হাজার নবী তশরীফ এনেছেন, কিন্তু কোন নবী দাড়িও মুন্ডায়নি এবং গোঁফও রাখেননি। অতএব, দাড়ি নবীগণের সুন্নাত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-দাড়ি বৃদ্ধি কর, গোঁফ খাট কর এবং মুশরিকদের বিরোধীতা কর। এছাড়া আরও অনেক দলীল দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা দলীল থেকে যুক্তিকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ওদের কাছে যেন গোলাপ ফুল থেকে গাঁদা ফুলের কদর বেশী। এজন্য নিম্নে যুক্তিসঙ্গতঃ কিছু বক্তব্যও পেশ করছিঃ

(১) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন সামরিক, পুলিশ, রেলওয়ে, ডাক ইত্যাদি এবং প্রত্যেক বিভাগের আলাদা আলাদা ইউনিফরম রয়েছে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে এদেরকে সহজে চেনা যায়। যদি কোন সরকারী কর্মচারী দায়িত্ব পালন করার সময় স্বীয় ইউনিফরম পরিধান না করে, তাহলে এর জন্য জরিমানা করা হয়। যদি বারবার বলার পরও মান্য না করে, তাহলে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। অনুরূপ আমরাও আল্লাহর সম্রাজ্যে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত গোলাম। আমাদের জন্য পৃথক বেশ ভূষা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। লাখো কাফিরের মধ্যে দাড়ালেও যেন আমাদেরকে চেনা যায়। যদি আমরা নিজেদের বেশভূষা ত্যাগ করি, তাহলে আমরাও শাস্তির ভাগী হবো।

(২) আল্লাহতাআলা মানুষের বাহ্যিক আকৃতির সাথে অন্তরের এমন সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন যে, একটির প্রভাব অন্যটির উপর প্রতিফলিত হয়। যদি কোন কারণে মন বিষন্ন হয়, তা চেহারায় ভেসে উঠে; তখন চেহারা মলিন দেখায়। কেউ দেখা মাত্র বলে দেয়, কি মন খারাপ? মনে আনন্দ থাকলে, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়। অনুরূপ যদি কারো ক্ষয়রোগ হয়, তখন ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে ওকে ভাল পরিবেশে রেখো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করাও এবং অমুক অষুধ পানির সাথে মিশায়ে গোসল করাও। দেখুন, রোগ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরে কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে শরীরের বাহ্যিক অংশে। কারণ বাহ্যিক অংশ সুস্থ হলে আভ্যন্তরীণ অংশও সুস্থ হয়ে যাবে। সুস্থ লোকের উচিত যে প্রতিদিন যেন গোসল করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে এবং স্বাস্থ্যসম্মত ঘরে বসবাস করে। এতে শরীর সুস্থ থাকে। খাদ্যের প্রভাবও মনের মধ্যে পতিত হয়। শুকুর খাওয়া শরীয়ত এজন্য হারাম করেছে যে এর দ্বারা মনের মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়। কেননা শুকুর হচ্ছে নির্লজ্জ পশু এবং শুকুরের মাংস ভোজী জাতিরাও নির্লজ্জ হয়ে থাকে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা তথাকথিত সভ্যদেশে দেখতে পাই। যদি চিতাবাঘ বা বাঘের চর্বি খাওয়া হয়, তাহলে মনের মধ্যে কঠোরতা ও হিংস্রতা সৃষ্টি হয়। চিতাবাঘ ও বাঘের চামড়ায় বসা এজন্য নিষিদ্ধ যে এর ফলে মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। মোটকথা স্বীকার করতেই হবে যে খাদ্য ও পোষাকের প্রভাব মনের মধ্যে পতিত হয়। তাই এটা স্বাভাবিক যে যদি কাফিরদের মত পোষাক পরিধান করা হয় বা তাদের মত বেশভূষা গ্রহণ

করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে কাফিরদের প্রতি মহব্বত ও মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি হবে। এটা লক্ষ্যণীয় যে বিধর্মীদের সাথে দাড়িবিহীন মুসলমানদের যে রকম দহরম মহরম, সে রকম দাড়িওয়ালাদের নেই। এজন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে - مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(যে অন্য জাতির আকৃতি গ্রহণ করে, সে ওদের অন্তর্ভুক্ত) সার কথা হচ্ছে মুসলমানদের মত আকৃতি গঠন কর, যেন মুসলমানদের মত স্বভাব-চরিত্র হয়।

(৩) হিন্দুস্থানে প্রায় সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে এবং অনেক জায়গা থেকে এরকম খবরও পাওয়া যায় যে দাঙ্গার সময় অনেক মুসলমান মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছে। কেননা হিন্দু, না মুসলমান তা চিনতে পারেনি। কয়েক বছর আগে, বেরলী ও পিলিবিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মারামারি হয়েছিল, সেখান থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, অনেক মুসলমানদেরকে স্বয়ং মুসলমানেরা হিন্দু মনে করে খতম করে দিয়েছে। এটা সেই আধুনিক ফ্যাশনেরই পরিনাম। আমার রূহানী নেয়ামত মুর্শেদে বরহক হযরত সদরুল আফাযেল মাওলানা মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেছেন যে একবার তিনি ট্রেন যোগে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। মাঝখানের এক স্টেশন থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন, যাকে দেখতে হিন্দু মনে হচ্ছিল। ট্রেনে খুবই ভিড় ছিল। বেচারা এক বাবুর পার্শ্বে বসতে গিয়ে ওর সাথে ঝগড়া বেঁধে যায়। বাবুর সঙ্গী সাথীরা অধিক ছিল বিধায় ওকে খুবই মারধর করলো। কিন্তু কোন মুসলমান ওকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল না। মনে করলো যে হিন্দুরা পরস্পর ঝগড়া করতেছে, ওখানে জড়িত হয়ে লাভ কি। শেষ পর্যন্ত বেচারা ভাল মতে মার খেয়ে লজ্জায় একদিকে মুখ ফিরায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পরবর্তী স্টেশনে সে যখন 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে নেমে যাচ্ছিল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, বেচারা মুসলমান। তখন তিনি খুবই আফসোস করলেন এবং ওকে বললেন, ভাই, আপনার ফ্যাশনই আপনাকে মার খাওয়ালো। যখন আমি কোন সময় হাট-বাজারে যাই, তখন আমি সমস্যায় পড়ে যাই যে সালাম কাকে করবো, কে হিন্দু, কে মুসলিম, তা চেনা মুস্কিল। অনেকবার আমি সালাম করে নমস্কার শুনে লজ্জা পেয়েছি। যতদূর সম্ভব মুসলমানের দোকান থেকে কেনাকাটা করাটা আমার একান্ত ইচ্ছে থাকে। কিন্তু দোকানদারের বেশভুষা দ্বারা সহজে চেনা যায় না। অবশ্য দোকানে কোন সাইনবোর্ড থাকলে, নাম দেখে জানা যায়-হিন্দু, না মুসলমান। অন্যথায় খুবই মুস্কিল হয়ে পড়ে। তাই মুসলমানদের আকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদ আলাদা হওয়া উচিত।

(৪) কার মৃত্যু কোথায় হবে, এটা কারো জানা নেই। যদি আমরা বিদেশে মারা যাই এবং সেখানে আমাদের পরিচিত কেউ না থাকে বা আমাদের বেশভূষায় পার্থক্যমূলক কিছু না থাকে, তাহলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। স্থানীয় লোকেরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে যে দাফন করবে, নাকি জ্বালিয়ে ফেলবে। কয়েক বছর আগে আলীগড়ে এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তি ট্রেনে মারা যায়, আলীগড় স্টেশনে রাত্রে লাশ নামানো হয় কিন্তু বাহ্যিকভাবে সনাক্ত করার মত কিছু না থাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মহা সমস্যায় পড়লো লোকটি হিন্দু, না মুসলমান, দাফন করবে, না জ্বালিয়ে ফেলবে, কিছুই স্থির করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর কাপড় খুলে দেখা হলো, তখন জানা গেল যে লোকটি মুসলমান। সার কথা হলো মুসলমানদের জন্য কাফিরদের বেশভূষা জীবিতাবস্থায়ও মারাত্মক এবং মৃত্যুর পরও।

(৫) মাটিতে যখন বীজ বপন করা হয়, তখন প্রথমে একটি সোজা কান্ড বের হয়। এরপর সেই কান্ডের চারদিকে শাখা প্রশাখা বের হয়। অতঃপর সেটাতে ফল ধরে। যদি কোন ব্যক্তি চারিদিকের ডাল ও পাতাগুলো কেটে ফেলে, তাহলে ফল খেতে পারে না। অনুরূপ কলেমা তৈয়্যবা হচ্ছে বীজ, যা মুসলমানের অন্তরে বপন করা হয় এবং চেহারা, হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি হচ্ছে মানববৃক্ষের শাখা প্রশাখা। সেই কলেমা মুসলমানের চোখকে সংযত করে, হাতকে হারাম জিনিস স্পর্শ করা থেকে বিরত রেখে, চেহারায় ঈমানী নিশানা স্থাপন করে, কানকে গীবত শুনা এবং মুখকে মিথ্যা বলা, গীবত করা থেকে বিরত রেখে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান কিন্তু কাফিরদের মত চেহারা করে এবং হাত-পা নাক, কান, মুখকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখেনি, সে ওই ব্যক্তির মত, যে বীজ বপন করেছে এবং চারা বড় হওয়ার পর সমস্ত ডালপালা কেটে ফেললো। যেমন সেই বোকা ফল থেকে বঞ্চিত থাকবে, তেমন সেই মুসলমান ইসলামের ফল থেকে বঞ্চিত থাকবে।

(৬) পাকা রং হচ্ছে সেটা, যেটা পানি বা ধোলাই দ্বারা যায় না আর কাঁচা রং হচ্ছে সেটা, যেটা চলে যায়। অতএব হে মুসলমানগণ! আপনারা আল্লাহর রঙে রঙিত- صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

(আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম এবং আল্লাহর রং থেকে সুন্দর কার রং?) যদি আপনারা কাফিরদেরকে দেখে নিজেদের রং হারিয়ে ফেলেন, তাহলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মনে করবেন যে আপনাদের রং কাঁচা ছিল। পাকা রং হলে পরিবর্তন আসতো না।

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

(১) অনেক মুসলমানের মুখে এটা শুনা যায় যে, আল্লাহ অন্তর দেখে, আকৃতি দেখে না। তাই অন্তর পরিষ্কার হলেই যথেষ্ট। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে। إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ بَلْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوبِكُمْ

(আল্লাহতাআলা তোমাদের আকৃতি দেখেন না বরং তোমাদের অন্তর দেখেন) এ অজুহাতটা শিক্ষিত মুসলমানেরাই বেশী দেখায়ে থাকে।

উত্তরঃ যদি বাহ্যিক অংশের কোন গুরুত্ব না থাকে এবং অন্তরই প্রধান, তাহলে বাহ্যিক দিকটাকে অবশ্য অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু তা কি সম্ভব? কেউ যদি কারো জন্য উন্নতমানের বিরয়ানী-পোলাও তৈরী করে এমন পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখে যেটাতে মল মূত্র লেগে আছে, তাহলে সেটা কি কেউ কখনও খাবে? নিশ্চয়ই না। অনুরূপ আল্লাহতাআলাও আমাদের বিশ্রী আকৃতির মধ্যে ঢেকে রাখা উন্নত আমলসমূহ কবুল করবেন না। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সাথে সাথে বেশভূষায় এর আমলও প্রকাশ পাওয়া চাই। যে কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু বেশভূষা অবলম্বন করে কুরআনের বিপরীত, সে স্বীয় আমলের ব্যাপারে মিথ্যুক। রাষ্ট্র প্রধানের আগমন উপলক্ষে রেষ্ট হাউসের প্রবেশ দ্বার ও ভিতর অংশ উভয়টা পরিষ্কার রাখতে হয়। কেননা প্রবেশ দ্বার দিয়েইতো প্রবেশ করবেন এবং ভিতরে গিয়ে অবস্থান করবেন। উল্লেখিত হাদীছের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহতাআলা কেবল তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি দেখেন না বরং আকৃতির সাথে অন্তরও দেখেন। যদি এ অর্থ না হয়, তাহলে মাথায় টিকি ও গলায় পৈতা পরে নামায পড়া জায়েয হওয়া উচিত ছিল। অথচ ফকীহগণ টিকি রাখা ও পৈতা পরাকে কুফর বলেছেন।

(২) ইসলামী বেশভূষায় আমাদের কোন ইজ্জত-সম্মান নেই। ইংরেজী পোষাক পরলে আমাদেরকে সবাই সম্মান করে। কেননা সেটা উন্নত জাতির পোষাক।

উত্তরঃ মানুষের ইজ্জত পোষাকের দ্বারা হয় না বরং পোষাকের ইজ্জত মানুষের দ্বারা হয়ে থাকে। যদি আপনাদের মধ্যে কোন প্রতিভা থাকে বা আপনারা যদি কোন সম্মানিত ও উন্নতজাতির সদস্য হয়ে থাকেন, তাহলে যে রকম পোষাক পরিধান করেন না কেন, আপনাদের সম্মান অবশ্যই করা হবে আর ওসব গুণাবলী

না থাকলে, যে রকম পোষাক পরিধান করেন না কেন, কোন ইজ্জত সম্মান করা হবে না। গান্ধী যখন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডনে গিয়েছিলেন, তখন ওনার পরনে ছিল নেংটি এবং মাথায় ছিল টিকি। এ পোষাকেই তিনি পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করেছিলেন। সুবাস চন্দ্র বোসও ধূতি-চাদর পরে লন্ডনে গিয়েছিলেন। এ পোষাকের দ্বারা কি ওনাদের ইজ্জত কমে গিয়েছিল? আজকাল একমাত্র মুসলমান ছাড়া অপরাপর প্রায় জাতি নিজস্ব জাতীয় পোষাকই পরিধান করে থাকে। হিন্দু, শিখ, খোজা সবাই স্বজাতীয় পোষাকই পরিধান করে। শিখদেরকে সব জায়গায় মুখে দাড়ি, মাথায় চুল ও পাগড়ী এবং হাতে লোহার চুড়ি পরিহিত দেখা যায়। তাই বলে কি ওরা কোন জায়গায় অপদস্ত হয়েছে? ওদের সেই পোষাকে যে সম্মান, সেটা কোট-টাইতে নেই। বন্ধুগণ; যদি সম্মান চান, তাহরে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যান এবং স্বজাতির উন্নতি করুন।

(৩) দাড়িতে কি ফায়দা আছে? মওলভী-মোল্লারা আজ সমাজে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে।

উত্তরঃ দাড়ি ও অন্যান্য ইসলামী বেশভূষার সৌন্দর্যের কথা ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। ইসলামের প্রতিটি কাজ অগণিত হেকমতে ভরপুর। শুনুন, মিসওয়াক করা সুন্নাত। এতে অনেক ফায়দা রয়েছে-দাঁত ও মাড়ি, মজবুত করে, মুখ পরিষ্কার করে, মুখের দুগন্ধ নিবারণ করে পরিপাক যন্ত্র ভাল রাখে অর্থাৎ হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, বাকশক্তি বৃদ্ধি পায়, দাঁত পরিষ্কার রাখে, জানকবচ সহজ হয়, কফ হ্রাস করে, মাথার রগ সমূহ মজবুত করে, মৃত্যুর সময় কলেমা স্মরণ আসে। মিসওয়াকের ছত্রিশটি ফায়দার কথা শামী ও অন্যান্য হেকিমী কিতাবে উল্লেখিত আছে।

মুসলমানদের খত্না দেড়শ' রোগের জন্য উপকারী। প্রধানতঃ পুরুষের যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পুরুষাঙ্গে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকতে পারে না, শক্ত-সামর্থ সন্তান লাভ করে, খত্নাকৃত পুরুষের স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় না ইত্যাদি। অনেক রোগের জন্য ডাক্তাররেরা হিন্দু ছেলেদেরও খত্না করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকে।

নখে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে। সেই নখ খাবার বা পানিতে ডুবালে, সেই খাবার দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়। এজন্য ইংরেজরা কাটা চামুচ ও ছুরি দ্বারা খাবার গ্রহণ করে, কেননা ওরা খুব কমই নখ কাটে। আগের যুগের লোকেরা যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পানিতে নখ লাগে, সেটা পান করতো না। কিন্তু ইসলাম নখ কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং ছুরি, কাটা চামুচের ঝামেলা থেকে রক্ষা করলেন। এ রকম গোঁফেও বিষাক্ত পদার্থ মওজুদ থাকে। পানি পান করার সময় গোঁফ যদি পানিতে লাগে, তাহলে সেই পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য আজকাল অনেক আধুনিক ফ্যাশন পূজারী লোকেরা গোঁফ মুন্ডায়ে ফেলে। ইসলাম গোঁফ মুন্ডানোর পরিবর্তে খাটো করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা গোঁফ মুন্ডালে পুরুষত্বের লাঘব ঘটে। দাড়িরও অনেক উপকার রয়েছে। প্রধান উপকার হচ্ছে, দাড়ি পুরুষের চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং এটা চেহারার নুর। মহিলার জন্য যেমন মাথার চুল বা লোকের জন্য যেমন চোখের পলক-ভ্রু সৌন্দর্যদায়ক, তেমন পুরুষের জন্য দাড়ি সৌন্দর্যদায়ক। কোন মহিলার মাথার চুল মুন্ডায়ে ফেললে বা কোন লোক স্বীয় ভ্রু ও পলক কেটে ফেললে যে রকম খারাপ দেখায়, সে রকম দাড়ি কেটে ফেললেও খারাপ দেখায়।

দাড়ি পুরুষকে অনেক গুনাহ থেকে বিরত রাখে। কেননা দাড়ির দ্বারা পুরুষের মধ্যে একটা আভিজাত্য ভাব সৃষ্টি হয়, যার ফলে কোন মন্দ কাজ করতে লজ্জাবোধ করে। যদি কেউ দেখে ফেলে, বলবে যে দাড়ি নিয়ে তুমি এ কাজ করতে পার, দাড়ি নিয়ে এ কাজ করতে তোমার লজ্জা হলো না-এ ধারণায় দাড়িওয়ালা ব্যক্তি অনেক বাজে কথা ও প্রকাশ্যে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা পরীক্ষিত যে খোদার ফজলে নামায ও দাড়ি অনেক পাপাচার থেকে বিরত রাখে।

দাড়ির দ্বারা পুরুষের যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এক হেকিম সাহেবের কাছে পুরুষত্বহীন এক রোগী এসে বললো আমি আমার এ দুর্বলতার জন্য অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু কোন উপকার হলো না। হেকিম সাহেব লোকটাকে দাড়ি রাখার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন এটা এ রোগের শেষ চিকিৎসা। হেকিম সাহেব আরও বললেন মানুষের শরীরের কতেক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। উপরের দাঁত চোখের সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ উপরের দাঁত ফেলে দেয়, তাহলে ওর চোখ খারাপ হয়ে যাবে। পায়ের তলাও চোখের সাথে সম্পর্কিত। যদি চোখে গরম পড়ে, পায়ের তলা মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায় এবং ঘুম না আসলে, পায়ের তলায় ঘি ও লবণ মালিশ করলে ঘুম এসে যায়। অনুরূপ পুরুষত্ব ও বীর্যের সাথে দাড়ির সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য মহিলা নাবালগ ছেলে ও নপুংসকের দাড়ি গজায় না। লোকেরা যে বলে, মওলভীদের সন্তান বেশী হয় এবং ওনাদের স্ত্রীগণ চরিত্রহীনা নয়, এর প্রধান কারণ ওনাদের

দাড়ি। নাভির নিচের লোম যৌন শক্তির জন্য ক্ষতিকর। এজন্য শরীয়তে সেটাকে পরিস্কার করার জন্য হুকুম দিয়েছে। যদি পারা যায়, প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা উচিত। অন্যথায় পনেরদিন বা বিশদিন পর নিশ্চয় যেন পরিষ্কার করে। প্রতিটি সুন্নাত কাজ হেকমত পূর্ণ।

আমি 'আনওয়ারুল কুরআন' নামে একটি কিতাব লিখেছি, যার মধ্যে নামাযের রাকাত সমূহ, অযু, গোসল এবং অন্যান্য ইসলামী কাজের হেকমতসমূহ বর্ণনা করেছি। এমনকি ইসলামের শাস্তি বিধান যেমন চুরির শাস্তি হাত কাটা, যেনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির হেকমতও বর্ণনা করেছি। তাছাড়া তফসীর নঈমীতেও ইসলামী বিধানাবলীর উপকারিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গোঁফও যৌনশক্তির জন্য খুবই উপকারী। কিন্তু ওগুলোর মাথায় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এজন্য ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ওগুলোকে খাটো কর কিন্তু একেবারে মুণ্ডায়ে ফেল না।

(৪) আজকের পৃথিবীর প্রায় জায়গায় দাড়িবিহীনদেরই রাজত্ব। ধনদৌলত, রাজত্ব সব ওদের হাতে। এতে বুঝা যায় দাড়ি না রাখাটাই কল্যাণকর। (অনেক মুসলমান এটা রসিকতা করে বলে থাকে।)

উত্তরঃ যদি দাড়ি মুন্ডানোর দ্বারা রাজত্ব ধনদৌলত ইজ্জত পাওয়া যেত, তাহলে অনেক লোক যে দাড়ি মুণ্ডায়ে হ্যাট, কোট পেন্ট পরে সারা জীবন অতিবাহিত করলো, কৈ রাজত্বেরতো কিছুই পেলনা। মেথর, চামার, ঝাড়ুদার সবাইতো দাড়ি মুণ্ডায়, কৈ ওরাতো রাজত্ব পেল না। জনাব, ইজ্জত সম্মান, ধনদৌলত রাজত্ব যেটাই চান, সেটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গোলামীর দ্বারাই পাওয়া যায়-

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

(এবং তোমরা বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও) আজ অন্যদেরকে তোমাদের শাসক এজন্য করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা শাসনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। অন্যথায় এসব সম্মান তোমাদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। কয়েকশ বছর আগের ইতিহাস দেখুন, ভারতবর্ষসহ আরব-অনারবের প্রায় মুসলিম রাজা-বাদশাগণ দাড়িওয়ালা ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি সূক্ষ্ম কথাঃ এক মুসলমান আমাকে বললো, ইসলাম আমাদেরকে উন্নতি থেকে বাধা-দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে? সে বললো, ইসলাম সুদ হারাম এবং যাকাত ফরয করলো। অতঃপর এ শেরটি পাঠ করলোঃ

کیو نکر هوان اصولون میں افلاس سے نجات

یاں سود توحرام هے اور فرض هے زکواة!

অর্থাৎ সেই নীতিসমূহে কীভাবে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, যেখানে সুদ হারাম এবং যাকাত ফরয।

আজ অন্যান্য জাতি সুদের কারণে উন্নতি করছে। যদি আমরাও সুদের কাজ কারবার করতাম, তাহলে আমরাও উন্নতি লাভ করতে পারতাম। আমি বললাম, আজ দুনিয়াতে যত মছীবত, সব সুদের কারণেই হয়েছে। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীগণ, যারা একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায়, তারা হয়তো জুয়ার কারণে অথবা হুন্ডির আদান প্রদান বা সুদী ব্যবসার কারণে এ রকম হয়ে যায়। যদি মানুষ স্বীয় পুঁজি মুতাবিক সততা ও আমানতদারীর সাথে ব্যবসা করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ ওর ব্যবসা অটল থাকবে। আর যাকাত প্রদানে সমগ্র জাতির আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে। অবশ্য যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। যাকাত দিলে স্বীয় মাল নিরাপদ হয়ে যায়। যাকাত প্রদত্ত মাল বিনষ্ট হয় না। আঙ্গুর ও কুল গাছের ডাল কাটলে অধিক ফলন হয়। অনুরূপ যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহতাআলা প্রত্যেক কিছু থেকে যাকাত আদায় করে। শরীরের অসুখ বিসুখ সুস্থতার যাকাত, নখ ও চুল কাটা অংগের যাকাত। অনুরূপ সম্পদেরও যাকাত হওয়া উচিত। মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হলো বেকারত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনীহা এবং উদাসীনতা। এটা পরীক্ষিত সত্য যে মুসরমানদের জন্য সুদ ফলদায়ক নয় বরং ক্ষতিকর। অন্যান্য জাতি সুদের দ্বারা উন্নতি লাভ করে কিন্তু মুসলমান ক্ষতির সম্মুখীন হয় বরং যাকাত প্রদানের দ্বারা মুসলমানের উন্নতি হয়। পায়খানার পোকা পায়খানা খেয়ে জীবন ধারণ করে আর বুলবুল পাখী ফুল ভক্ষণ করে জীবনধারণ করে। মুসলমানগণ! আপনারা হলেন বুলবুল পাখী সদৃশ। ফুল তথা হালাল খেয়ে জীবনধারণ করুন, হারামের প্রতি ললায়িত হবেন না। হালালে বরকত আছে, হারামে কোন বরকত নেই। দেখুন, একটি ছাগল বছরে একটি অথবা দু'টি বাচ্চা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার ছাগল জবেহ করা হয়। আর কুকুর বছরে ছয়/সাতটা বাচ্চা দেয় এবং কোন কুকুর জবেহও করা হয় না। তা সত্বেও পথে ঘাটে অনেক ছাগলের পাল দেখা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও কুকুরের পাল দৃষ্টিগোচর হয়নি। এর কারণ হলো কুকুর হারাম এবং ছাগল হালাল। তাই ছাগলের মধ্যে বরকত রয়েছে।

(৫) দাড়ি-গোঁফ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার। যে যা খুশী তা করবে। এতে মওলভী ছাহেবরা কেন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে? ঘরের ক্ষেত যখন ইচ্ছে এবং যেভাবে ইচ্ছে কাট ও ব্যবহার কর।

উত্তরঃ এ ধারণা ভুল। আমাদের নিজস্ব বলতে কিছু নেই। প্রত্যেক জিনিস আল্লাহতাআলার। আমাদেরকে কয়েকদিন ব্যবহার করার জন্য দেয়া হয়েছে। পুনরায় আসল মালিকের হয়ে যাবে। কেউ কারো চরকা ধার নিল। এ চরকায় যা সুতা কাটা হলো, তা নিজের কিন্তু চরকা চরকাওয়ালার। আমাদের আমলসমূহ হচ্ছে সুতা বিশেষ এবং এ শরীর হচ্ছে চরকা। কোম্পানীর কোন মেশিন কাউকে দিলে সেটার সাথে একটা ব্যবহার পদ্ধতির বইও দিয়া দেয়। কেননা মেশিন গ্রহীতা এর পরিপূর্ণ চালনা সম্পর্কে অজ্ঞ। মাঝে মধ্যে মেশিন চালনা শিখানোর জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে অভিজ্ঞ লোকও নিয়োগ করা হয়। যাতে সেই বই অনুসরণ করে এবং কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত অভিজ্ঞ লোক থেকে ভাল মতে মেশিন চালনা শিখে। যদি মনগড়া উল্টা পাল্টা মেশিন চালনা শুরু করে, তাহলে খুবই সহসা মেশিন ভেঙ্গে যাবে এবং মেশিন থেকে নিজেও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপ আমাদের শরীর হচ্ছে মেশিন, হাত-পা ইত্যাদি হচ্ছে কল-কব্জা। এ মেশিন আমরা আল্লাহর কুদরতের কারখানা থেকে পেয়েছি। এর ব্যবহার শিখানোর জন্য কারখানার মালিক একটি কিতাব তৈরী করেছেন, যার নাম কুরআন মজীদ এবং এ মেশিনে কাজ শিখানোর জন্য এমন এক সর্বজান্তা বিশ্ব প্রশিক্ষক প্রেরণ করেছেন, যার পবিত্র নাম মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সেই বিশ্ব প্রশিক্ষকই আমাদেরকে এ মেশিন চালনা করে দেখিয়েছেন। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

হে অলসগণ, হে মেশিনের অধিকারীগণ, যদি সঠিকভাবে মেশিন চালাতে চাও, তাহলে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্শিত নিয়ম মতে চালাও। শরীরের উপর যে রকম প্রাণ কর্তৃত্ব করে এবং প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গ এর মর্জি অনুসারে নড়াচড়া করে, সে রকম প্রাণের উপর সুলতানুল কাউনাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত করুন, যেন প্রতিটি কাজকর্ম তাঁরই মর্জি মোতাবেক হয়। একেই বলে তাছাওফ এবং এটাই হচ্ছে হাকীকত মারেফত এবং তরীকতের মূল।

হযরত সদরুল আফাযেল মাওলানা নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) খুবই সুন্দর বলেছেনঃ

کھول دو میرا سینه فاتح مکه أکر

کعبه دل سے صنم کھینچ کے کر دو باهر

أپ أجائیے قلب مین میرے جان بن کر

سلطنت کیجئے اس جسم مین سلطان بن کر

অর্থাৎ ওগো মক্কা বিজয়ী, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বুক খুলে দিন এবং এ বুক থেকে সমস্ত অপদার্থ বের করে দিন। আপনি আমার বুকে প্রাণ হিসেবে আগমন করুন এবং এ শরীরে বাদশা হিসেবে রাজত্ব করুন।

ইসলামী বেশভূষা

মানুষের চুল, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নিজস্ব মাপকাঠি রয়েছে। মাথার চুলের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে সব রেখে দেয়া, অথবা সব সমানভাবে কেটে ফেলা অথবা সব মুণ্ডায়ে ফেলা। ইংলিশ কাটিং এর মত কিছু কেটে ফেলা এবং কিছু রাখা নিষেধ। আবার কিছু রাখা এবং কিছু মুণ্ডায়ে ফেলাও নিষেধ। যেমন কতেক লোক মাথার মাঝখানে পানের মত করে চুল রাখে। মাথার সামনের অংশে সিড়ির মত করে চুল রাখাও নিষেধ। কতেক মুর্খ মুসলমান শিশুদের মাথায় হিন্দুদের মত টিকি রাখে, এসব নিষেধ। যারা পুরো চুল রাখতে ইচ্ছুক, তারা কানের লতি পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত যেন চুল রাখে। এ রকম রাখা সুন্নাত। তবে মেয়েদের মত জুঁটি বাঁধা নিষেধ। গোঁফ এতটুকু কাটা প্রয়োজন যেন উপরের ঠোঁটের রেখা দেখা যায়। একেবারে না কাটা বা একেবারে মুন্ডায়ে ফেলা নিষেধ। দাঁড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা প্রয়োজন অর্থাৎ চিবুকের নিচে যে দাড়িগুলো থাকে, সেগুলো হাতের মুঠে নিলে, যা মুঠের বাইরে থাকে, সেগুলো যেন কেটে ফেলা হয় অর্থাৎ এক মুঠোর কমও না হওয়া চায় এবং বেশীও না হওয়া চায়। আশপাশের দাড়িও যা মুষ্টির মধ্যে এসে যায়, তা যেন রেখে দেয়া হয়।

নাকের লোম কাটা এবং বগলের লোম উপড়ায়ে ফেলা সুন্নাত। বগলের লোম মুণ্ডায়ে ফেললেও কোন ক্ষতি নেই। নাভির নিচের লোম মুণ্ডায়ে ফেলা সুন্নাত। হাত পায়ের নখ কাটাও সুন্নাত। এসব কাজ প্রতি সপ্তাহে একদিন করা উত্তম। তবে প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হলে চল্লিশ দিনের অধিক দেরী না করা চায়। সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নিষেধ।

ইসলামী পোষাক পরিচ্ছদ

পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। যদি নামাযে উল্লেখিত অংশ খোলা থাকে, নামায হবে না। নামায ছাড়াও উল্লেখিত অংশ একাকী অবস্থায়ও বিনা কারণে খোলা রাখলে গুনাহগার হবে। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী পোষাক হচ্ছে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, পূর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট কামিজ বা কোর্তা পরিধাণ করা, পায়ের গিরার উপরে লুঙ্গি বা পায়জামা পরা। এগুলো ছাড়া আছকান, ওয়াজ কোট ইত্যাদি পরতে পারেন। তবে কাফিরদের পোষাকের অনুরূপ না হওয়া চাই। পাগড়ীর নিচে টুপি থাকা আবশ্যক। যদি টুপি না থাকে, তাহলে মাথাকে ভালমতে ঢেকে পাগড়ী বাঁধতে হবে। অন্যথায় মারাত্মক গুনাহ হবে। টুপি-গান্ধি টুপি, হ্যাট বা হিন্দুদের গোল টুপির অনুরূপ না হওয়া চাই। একটি কথা মনে রাখবেন, যে পোষাক কাফিরদের জাতীয় চিহ্ন, সেটার ব্যবহার মুসলমানদের জন্য হারাম। যেমন হ্যাট, হিন্দুয়ানী ধূতি ইত্যাদি এবং যে পোষাক কাফিরদের সাম্প্রদায়িক পরিচিতি হিসেবে স্বীকৃত, সেটা ব্যবহার করা কুফরী। যেমন-হিন্দুদের টিকি, পৈতা, খ্রীষ্টান জাতির ক্রশ চিহ্ন ইত্যাদি। এসব পোষাক দেখলে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে যে লোকটা হিন্দু, না খ্রীষ্টান। এ জাতীয় পোষাক থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন।

নিজের ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চর্চা বজায় রাখুন, নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে নামাযের একান্ত অনুসারী করুন। সাত বছরের ছেলেমেয়েদেরকে নামায পড়ার তাগিদ দিন এবং দশ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে নামায পড়ার জন্য একান্ত চাপ সৃষ্টি করুন। রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে যাবেন, ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে ছেলেমেয়েদেরকে জাগাবেন, কেননা তখন রহমত নাযিল হওয়ার সময়। ছেলেমেয়েদেরকে সব কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করার তালীম দিন। সকালে আপনার ঘর থেকে যেন কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কুরআনের আওয়াজ

মসীবত বিদূরীত করে। এক ঘন্টা এসব নেক কাজে ব্যয় করুন। অতঃপর আল্লাহর নাম নিয়ে দুনিয়াবী কাজ কর্মে নিয়োজিত হয়ে যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের জন্য পর্দা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় এবং পর্দাহীনতা খুবই ক্ষতিকর। হে মুসলিম জাতি! আপনারা যদি দীন-দুনিয়া উভয় জাহানের উন্নতি কামনা করেন, তাহলে মেয়েদেরকে ইসলামী নির্দেশ মোতাবিক পর্দার মধ্যে রাখুন। আমি নিম্নে পর্দা সম্পর্কে কিতাবি ও যুক্তিগত দলীল এবং পর্দাহীনতার কুফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

আল্লাহতাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে পৃথক পৃথক কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে অনুসারে ওর আকৃতিও তৈরী করেছেন। সুতরাং যাকে যে কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে, ওর থেকে সেই কাজই আদায় করা উচিত। যে এর বিপরীত কাজ করবে, সে নিশ্চয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এর অগণিত উদাহরণ রয়েছে। টুপি মাথায় দেয়ার জন্য এবং জুতা পায়ে পরার জন্য তৈরী করা হয়েছে। যে জুতা মাথায় রাখে এবং টুপি পায়ে দেয়, সে পাগল। গ্লাস পানি পান করার জন্য, থুঁকদানি থুঁথুঁ ফেলার জন্য তৈরী করা হয়েছে। যে থুঁকদানে পানি পান করে এবং গ্লাসে থুঁথুঁ ফেলে, সে বদ্ধ পাগল। ষাড়ের জায়গায় ঘোড়া এবং ঘোড়ার জায়গায় ষাড় দ্বারা কাজ হতে পারে না। অনুরূপ মানুষকে দু'ভাগ করা হয়েছে-মহিলা ও পুরুষ। মহিলাকে ঘরের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুরুষকে বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি প্রবাদ আছে যে পঞ্চাশজন মহিলার উপার্জনের মধ্যে সেই বরকত নেই, যা একজন পুরুষের উপার্জনের মধ্যে রয়েছে এবং পঞ্চাশজন পুরুষের দ্বারা ঘরে সেই সৌন্দর্য শোভা পায় না, যা একজন মহিলার দ্বারা শোভা পায়। এজন্য স্বামীর জিম্মায় স্ত্রীর সমস্ত ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর জিম্মায় স্বামীর ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কেননা মহিলাকে উপার্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। মহিলাদেরকে এমন কিছু বিষয় দেয়া হয়েছে, যার ফলে ওদেরকে বাধ্যগতভাবে ঘরে থাকতে হয় এবং পুরুষদেরকে এসব বিষয় থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। যেমন সন্তান প্রসব, হায়েজ, নিফাস, শিশুদেরকে দুধ পান করানো ইত্যাদি। শৈশব কাল

থেকেই ছেলেদের দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি এ জাতীয় খেলাধূলা পছন্দ, যেমন হাডুডু, বল, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি এবং মেয়েদের প্রকৃতিগতভাবে ওসব খেলা পছন্দ নয়, বরং এক জায়গায় বসে খেলাধূলা করাই ওদের পছন্দ; যেমন মিছামিছি রান্নাবান্না করা, পুতুল তৈরী করা ইত্যাদি। ছোট মেয়েদেরকে কোন সময় হাডুডু, কপাটি খেলা খেলতে দেখা যায় না। এতে বুঝা যায়, আল্লাহতাআলা ছেলেদেরকে বাইরের কাজের জন্য এবং মেয়েদেরকে ঘরের কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন যারা মেয়েদেরকে বাইরে কাজ করার এবং পুরুষদেরকে ঘরে কাজ করার পরামর্শ দেয়, তারা সেই পাগলের মত, যে টুপি পায়ে এবং জুতা মাথায় দেয়। যখন এতটুকু বুঝে আসলো যে পুরুষ ও মহিলাকে একই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, তাহলে যারা উভয়কে একই কাজে নিয়োজিত করতে চায়, তারা কুদরতের বিরোধীতা করে। এতে কখনও সফলকাম হওয়া যায় না। বিষয়টা এভাবে বুঝে নিন, পুরুষ ও মহিলা হচ্ছে জিন্দেগীর দু'টি চাকা। এ দু'টি চাকাকে দু'জায়গায় ফিট করা হয়েছে। যদি উভয় চাকাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়, তাহলে জিন্দেগীর গাড়ী অচল হয়ে যাবে। এখন আমি এ ব্যাপারে কিতাবি ও যুক্তিগত দলীল পেশ করছিঃ

(১) সব মুসলমান জানে যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা এবং এমন মা, যাদের পবিত্র কদমে পৃথিবীর সমস্ত মায়েরা উৎসর্গিত। যদি সেই পবিত্র স্ত্রীগণ মুসলমানদের থেকে পর্দা না করতেন, তাহলে বাহ্যতঃ কোন আপত্তিকর মনে হতো না। কেননা সন্তানদের সামনে পর্দা কিসের? কিন্তু সেই পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে কুরআন করীম ফরমায়েছেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

অর্থাৎ হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং আগের জাহিলিয়াত যুগের মত বেপর্দায় থেকো না।

এটাতো সেই বিবিগণকে বলেছেন, এবার মুসলমানদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন, তা দেখুন-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, যখন তোমরা নবীর স্ত্রীগণ থেকে ব্যবহারিক কোন কিছু প্রার্থনা কর, তাহলে পর্দার বাইর থেকে প্রার্থনা কর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখুন, প্রথম আয়াতে স্ত্রীগণকে ঘরে থাকতে বলেছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানগণকে বাইর থেকে প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন।

(২) মিশকাত শরীফে 'অন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, একদিন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর কাছে তশরীফ রেখে ছিলেন। সে সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মকতুম (রাদি আল্লাহু আনহু) হঠাৎ উপস্থিত হলেন। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদ্বয়কে বললেন- اِحْتَجِبَا مِنْهُ (ওর থেকে পর্দা কর) ওনারা আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ, উনিতো অন্ধ। হুযুর ফরমালেন, তোমরাতো অন্ধ নয়। এতে বুঝা গেল কেবল পুরুষ কর্তৃক মহিলাকে না দেখা নয়, বরং অপরিচিত মহিলাও যেন পর পুরুষকে না দেখে। দেখুন, এখানে পুরুষ অন্ধ। কিন্তু পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৩) এক যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। আগে আগে হযরত আনজশা (রাদি আল্লাহু আনহু) সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর সাথে কয়েকজন পর্দানশীন মহিলাও ছিলেন। হযরত আনজশার কণ্ঠস্বর খুবই মধুর ছিল। হুযুর ইরশাদ ফরমালেন, হে আনজশা! তোমার গান বন্ধ কর। কেননা আমাদের সাথে কাঁচা কাঁচ রয়েছে। (মিশকাত, শের অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এ হাদীছে মহিলাদের হৃদয়কে কাঁচা কাঁচ বলেছেন। এতে বুঝা গেল, পর্দার মধ্যে রয়েও মহিলা পুরুষের গান এবং পুরুষ মহিলার গান যেন না শুনে।

(৪) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে ঈদের নামায ও অন্যান্য নামাযেও যেন অংশগ্রহণ করে। ওয়াজের মাহফিলেও ওদেরকে যোগদান করার জন্য বলা হতো, কেননা ইসলাম সবেমাত্র দুনিয়াতে আবির্ভাব হয়েছিল। যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াজ মহিলারা না শুনে, তাহলে ওদের সম্পর্কিত শরীয়তের আহকাম কি করে জানা যাবে। কিন্তু এর পরও ওনাদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে যেন ঘর থেকে বের না হয়, রাস্তায় অপরিচিত কারো সঙ্গে যেন কথা না বলে, ফযরের নামায এতটুকু অন্ধকারে পড়া হতো যে যেন কেউ চিনতে না পারে মত নামায পড়ে বের হওয়া যায়, মহিলাদেরকে সবার পিছনে দাঁড়াতে হতো। কিন্তু হযরত ওমর স্বীয় খিলাফত কালে মহিলাদেরকে মসজিদে আসা ও ঈদগাহে যাওয়ার থেকেও

নিষেধ করলেন। মহিলাগণ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর কাছে অভিযোগ করলেন, আমাদেরকে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) নেক কাজসমূহ থেকে বাঁধা দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ফরমালেন, হুযুর (আলাইহিস সালাম)ও যদি এ যুগটা দেখতেন, তাহলে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বারণ করতেন। (শামী ও অন্যান্য কিতাব দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই যুগটা ছিল একান্ত খায়র ও বরকতের। আর এ যুগটা হলো পাপাচার ও ফিৎনা ফ্যাসাদের। ও সময় প্রায় পুরুষ পরহিজগার, আর এখনকার প্রায় লোক একান্ত চরিত্রহীন ও লম্পট প্রকৃতির। ও সময় সাধারণ মহিলারা সতী-সাধ্বী ও লজ্জাবতী ছিলেন আর এখনকার প্রায় মহিলা লজ্জাহীনা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। ওই সময় যখন মহিলাদেরকে পর্দা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলে এ যুগ সম্পর্কে কি আর বলার আছে?

(৫) ফকীহগণ বলেন, মহিলার মাথা থেকে উঠে যাওয়া চুল এবং পায়ের কাটা নখও যেন পরপুরুষ না দেখে। (শামী, সতর অধ্যায়) মহিলার উপর জুমার নামায ফরয নয় এবং ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। কেননা এ নামাযসমূহ জমাত সহকারে মসজিদে হয়ে থাকে কিন্তু মহিলাদেরকে বিনা শরয়ী প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবার অনুমতি নেই। মহিলার বেলায় হজ্বের জন্য সফর করা ওই সময় পর্যন্ত ফরয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ওর সাথে মুহরেম না থাকে। (শামী সতর অধ্যায় দ্রষ্টব্য) হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা) ওসীয়ত করেছিলেন যে আমাকে যেন রাত্রে দাফন করা হয়। কেননা, যদি দিনে দাফন করা হয়, তাহলে কমপক্ষে দাফনকারীদের আমার শরীর সম্পর্কে অনুমান হয়ে যাবে। এটাও তাঁর পছন্দ ছিল না। পর্দার কারণে শরীয়ত মহিলাদেরকে অনেক আহকাম থেকে রেহাই দিয়েছে।

বিবেচনার বিষয় যে, যেখানে মহিলাদের জন্য মসজিদে ও ঈদগাহে গিয়ে নামায পড়ার এবং কবরস্থানে গিয়ে যিয়ারত করার অনুমতি নেই, সেখানে বিপনী কেন্দ্র, পার্ক ইত্যাদিতে যাবার অনুমতি কিভাবে হতে পারে। এগুলো কি মসজিদ ও মক্কা শরীফ থেকে উত্তম?

বিঃ দ্রঃ যে সব হাদীছে মহিলাদের বাইরে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সে হাদীছগুলো হয়তো পর্দা ফরয হওয়ার আগের অথবা বিশেষ কারণে পর্দা সহকারে বের হওয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছগুলোকে কোন চিন্তাভাবনা না করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্দাহীনতার জন্য উপস্থাপন করা নিছক বোকামী। ওই সময় মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণ এটা ছিল যে তখন পুরুষদের সংখ্যা ছিল কম। এখনও যদি কোন দেশে কাফিরদের থেকে মুসলমান পুরুষ সংখ্যায় কম হয় এবং জিহাদ ফরযে আইন হয়ে পড়ে, তাহলে মহিলারা নিশ্চয়ই জিহাদে যোগদান করতে পারবে। ওসব জিহাদকে বর্তমান যুগের বেহায়াপনার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা আদৌ সঙ্গতঃ নয়।

অনেক সময় মুজাহিদগণ প্রয়োজনবশতঃ ঘোড়ার প্রস্রাবপান করেছেন, গাছের পাতা খেয়েছেন। এখন কি বিনা প্রয়োজনে সে কাজ করতে হবে? আল্লাহতাআলা এ রকম অবস্থা সৃষ্টি না করুক, যখন মহিলাদের যুদ্ধে যাওয়াটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত কিতাবি দলীল দ্বারা পর্দার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলাম। এবার যুক্তিগত প্রমাণ পেশ করছি।

(১) মহিলা ঘরের ধন এবং ধন ঘরের মধ্যে লুকায়ে রাখা হয়। প্রত্যেককে দেখালে চুরি হওয়ার ভয় থাকে। তাই মহিলাকে ঘরে রাখা এবং পর পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা প্রয়োজন।

(২) ঘরের মধ্যে মহিলা এ রকম, যেমন বাগানে ফুল এবং বাগানেই ফুল তরতাজা থাকে। যদি ছিঁড়ে বাইরে আনা হয়, তখন ম্লান হয়ে যায়। অনুরূপ মহিলা হচ্ছে ঘরের ফুল; ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে সুন্দর জীবনযাপন করে। বিনা কারণে ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এতে ওর সৌন্দর্য হ্রাস পায়।

(৩) মহিলার হৃদয় খুবই স্পর্শকাতর। অতি সহসা যে কোন কিছুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এজন্য ওদেরকে কাঁচা কাঁচ বলা হয়েছে। আমাদের দেশেও মহিলাকে দুর্বলচিত্ত বলা হয় এবং দুর্বলচিত্ত মহিলা কঠিন চিত্তধারী পুরুষের প্রভাবে সহজে প্রভাবান্বিত হয়ে যেতে পারে। তাই ওদেরকে পর পুরুষ থেকে নিরাপদে রাখা উচিত।

(৪) মহিলা হচ্ছে স্বীয় স্বামী, মা-বাপ এবং পরিবারের ইজ্জত-সম্মানের প্রতীক। ওরা হচ্ছে সাদা কাপড়ের মত। সাদা কাপড়ে মামুলি দাগও দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। মহিলাদের প্রতি পরপুরুষের দৃষ্টি হচ্ছে কুশ্রী দাগ সদৃশ। তাই এদেরকে ওসব দাগ থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

(৫) মহিলার সবচে' বড় প্রশংসা হচ্ছে ওর দৃষ্টি স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ না হওয়া। এজন্য কুরআন করীম হুরদের প্রশংসায় ইরশাদ ফরমান- قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ

(প্রতি প্রানা)। যদি মহিলার দৃষ্টি কয়েকজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন মনে করতে হবে যে সেই মহিলা স্বীয় রত্ন হারিয়ে ফেলেছে। গৃহকর্মে ওর মন বসবে না এবং শেষ পর্যন্ত সুখের সংসারে নেমে আসবে অমানিশা।

দু'টি আপত্তিঃ কতেক লোক পর্দার বিষয়ে দু'টি আপত্তি করে থাকে। প্রথম আপত্তি হচ্ছে মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখাটা ওদের প্রতি জুলুম। আমরা বাইরের নির্মল আবহাওয়া ভোগ করবো, ওদেরকে সেই নেয়ামত থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হবে। দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, মহিলাদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কারণে ওদের ক্ষয়রোগ হয়ে যায়। এজন্য ওদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।

উত্তরঃ প্রথম আপত্তির উত্তর হচ্ছে, ঘর মহিলার জন্য কারাগার নয় বরং বাগান। একজন মহিলা ঘরের কাজ কর্ম, ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করে এরকম সন্তুষ্ট থাকে, যে রকম বাগানে বুলবুল পাখী। ঘরে থাকা ওর জন্য জুলুম নয় বরং ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা। আল্লাহতাআলা ওকে ঘরে থাকার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ছাগলকে রাত্রে ঘরে থাকার মত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাঘ-ভাল্লুক ও শিকারী কুকুরকে রাত্রে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে মত সৃষ্টি করা হয়েছে। ছাগলকে রাত্রে ছেড়ে দেয়া হলে, এর প্রাণনাশের ভয় থাকে, শিকারী পশু একে খেয়ে ফেলতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর হচ্ছে, এটা পরীক্ষিত সত্য যে পর্দা ক্ষয় রোগের কারণ নয়। আমাদের আগের যুগের বুজুর্গ মহিলাগণ ঘরের দরজার খবরও রাখতেন না ; অথচ ওনারা ক্ষয়রোগ কাকে বলে, তাও জানতেন না। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে আজকাল যেসব এলাকার মহিলারা বিনা পর্দায় চলাফেরা করে, ওসব এলাকায় ক্ষয় রোগের আক্রমণ বেশী। ইউ,পিতে অধিকাংশ শরীফ পরিবারের স্ত্রী কন্যাগণ পর্দানশীন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে সেখানে মহিলাদের ক্ষয় রোগ খুবই কম বরং নাই বললেই চলে। আর একটি কথা হলো, পর্দা যদি ক্ষয় রোগের কারণ হয়, তাহলে পুরুষের কেন হয়ে থাকে?

বন্ধুগণ, ক্ষয় রোগের কারণ অন্য কিছু। স্মরণ রাখবেন, সুস্থতার জন্য দু'টি প্রধান মূলনীতি রয়েছে, যদি এগুলো অনুসরণ করা হয়, তাহলে ইনশা আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুস্থ থাকবে। একটি হচ্ছে ক্ষুধার্ত হয়ে আহার করা এবং পেট ভরে না খাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রা যাপন করা। বেশী চা পান ঠিক নয়। এতে ক্ষুধা নষ্ট হয় ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। আগের মহিলারা চা পান করতেন না; সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম করতেন। ফলে ভালমতে ক্ষুধা লাগতো এবং রাত্রে পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর নিদ্রা যাপন করতেন। ফলে সুস্থ থাকতেন। আজকাল আমরা দেখি যে পর্দানশীন মহিলাদের চেহারা উৎফুল্ল ও তরতাজা দেখায় কিন্তু পর্দাহীন মহিলাদেরকে এমন মনে হয় যেন ফুলে লু হাওয়া লেগেছে। বন্ধুগণ, ওসব আপত্তি হচ্ছে বাহানা মাত্র। ঘরকে খোলামেলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঘরের উঠানও খোলামেলা রাখুন, যেন মুক্ত আবহাওয়া ঘরে প্রবেশ করতে পারে। মহিলাও ছোট ছেলেমেয়েদেরকে চা পান ও শুষ্ক খাদ্য থেকে বিরত রাখুন। টাট্‌কা তরিতরকারী, মাছ-মাংস, দুধ, ঘি, ডিম ইত্যাদি যতদূর সম্ভব খাদ্য তালিকায় রাখুন। মহিলাদেরকে কখনো আরামপ্রিয় বানাবেন না।

ইসলামী পর্দা ও জীবনযাপনের রীতিনীতি

মহিলার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সতর। তাই কেবল চেহারা, কব্জি পর্যন্ত হাত এবং গিরা পর্যন্ত পা ব্যতীত শরীরের সমস্ত অংশ ঢেকে রাখা প্রয়োজন। উপরোক্ত তিন অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশ খোলা থাকলে নামায হবে না। সুতরাং মহিলার পোষাক এ রকম হওয়া চাই, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত অংগ ঢেকে রাখে এবং এ রকম পাতলাও না হওয়া চাই; যদ্বারা মাথার চুল বা পায়ের গোছা বা পেট দেখা যায়। ঘরের মধ্যে যদি একাকী বা স্বামীসহ বা মা-বাপের সামনে থাকে, তাহলে ওড়না খুলে রাখতে পারে কিন্তু দেবর বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় থাকলে যথারীরি ওড়না পরিহিতা অবস্থায় থাকা প্রয়োজন। স্বামী ব্যতীত যেই আসুক, যেন আওয়াজ করে ঘরে ঢুকে। নিম্নের কয়েকটি অবস্থার প্রেক্ষিত ছাড়া পুরুষ কর্তৃক অপরিচিত মহিলা দেখা নিষেধ-(১) ডাক্তার রোগীনীর রোগাক্রান্ত অংশ দেখা, (২) বিবাহের জন্য প্রস্তাবিত মহিলাকে চুপে চাপে দেখা (৩) যে মহিলার জন্য সাক্ষ্য দেয়া হবে, ওকে ওর সাক্ষী কর্তৃক দেখা, (৪) বিচারক যে মহিলার ব্যাপারে রায় দিবেন, ওকে প্রয়োজন মোতাবেক দেখা। ভবঘুরে মহিলাদের থেকেও যেন শরীফ মহিলাগণ পর্দা করেন (দুর্রুল মুখতার)।

নিম্নের কয়েকটি কারণ ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ-(১) ধাত্রী স্বীয় পেশার কারণে (২) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বিচারকের দরবারে (৩)

গোসল করানোকারী মহিলা মৃত মহিলাদেরকে গোসল দেয়ার জন্য (৪) পুরুষের অবর্তমানে কর্মরত মহিলা (৫) মা-বাপ ও একান্ত নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য ও এ জাতীয় অন্যান্য অতি জরুরী প্রয়োজনে মহিলা ঘর থেকে বের হতে পারে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আ'লা হযরত রচিত مروج النجا لخروج النساء কিতাব অধ্যয়ন করুন। ঘর থেকে বের হওয়ার যে প্রেক্ষিতগুলো আমি বর্ণনা করলাম, এর অর্থ এ নয় যে, বিনা পর্দায় বের হতে পারবে। অবশ্যই বোরখা পরিধান করে বের হতে হবে। তবে এ ধরনের বোরখা নয়, যে বোরখার মুখ খোলা থাকে এবং অনায়াসে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহিলাদের সফর সম্পর্কেও কিছু জানা উচিত। একাকী বা পরপুরুষের সাথে সফর করা মহিলাদের জন্য হারাম। মহিলার সাথে মুহরেম থাকা আবশ্যক। আজকাল একটি রেওয়াজ হয়ে গেছে যে, চিঠি বা ফোনে জানিয়ে দেয়া হয় যে, স্ত্রী বা পুত্র বধু বা মেয়েকে অমুক তারিখে অমুক গাড়ী যোগে পাঠানো হচ্ছে, স্টেশনে এসে ওকে যেন নিয়ে যায়। এ রকম করা না জায়েয এবং বিপদজনকও।

প্রায় ঘরে দেবর, দুলা ভাই ও অন্যান্যদের থেকে পর্দা করে না, ওদের সাথে হাসি-ঠাট্টা মশকরাকরা হয়। অনেক মহিলারা বলে যে ওদের থেকে পর্দা করার কোন প্রয়োজন নেই। এটা ভুল ধারণা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- الحمو الموت

দেবরতো এর থেকেও মারাত্মক। ওদের সামনে যথাযথ পর্দা করতে না পারলেও কমপক্ষে ঘোমটা সহকারে লাজুকতা বজায় রাখা উচিত। এ রকম টাইট ফিট পোষাক পরাও অনুচিত, যদ্বারা শরীরের আকৃতি বুঝা যায়। অবশ্য ঘরে স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ না থাকতে এ রকম কাপড় পরতে কোন বাঁধা নেই। স্মরণ রাখবেন, যে মহিলার সাথে কোন এক সময় হলেও বিবাহ হতে পারে, এমন লোক থেকে পর্দা করা প্রয়োজন। এবং যাদের সাথে বিবাহ কখনও জায়েয নয় যেমন-শ্বাশুর, পিতা, ভাই, জামাতা ইত্যাদি, ওদের সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর বলেছেনঃ-

چو زہرا باش از مخلوق دوپوش

که در آغوش شبیرے به بینی

অর্থাৎ হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর মত খোদা ভীরু পর্দানশীন হও, যাতে স্বীয় কোলে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মত সন্তান দেখতে পাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারী শিক্ষা

মেয়েদেরকে ওই ধরনের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখানো প্রয়োজন, যা ওদের পরবর্তী জীবনে কাজে আসে। সর্বপ্রথম ওদেরকে কোরান শিক্ষা দেয়া চাই। এরপর ওদেরকে পবিত্রতা, হায়েজ-নেফাস, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির মাসায়েল শিক্ষা দেয়া জরুরী। অতঃপর ওদেরকে চরিত্র গঠনমূলক কিতাবাদি পড়ানো উচিত, যেগুলোতে স্বামীর হক, সন্তান লালন-পালন, শ্বাশুরী, ননদ ইত্যাদির সাথে সুসম্পর্ক রাখার উপায় ইত্যাদির বিবরণ থাকে। সবচে' উত্তম হচ্ছে ওদেরকে নবীর জীবনী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদান করা যেন ওদের ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রভাব পতিত হয়। এরপর ওদেরকে রান্নাবান্না ও সেলাই কর্ম শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। সেলাই কর্ম এমন বিষয়, যেটা মৃত্যুর পরও কাজে আসে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সেলাই করা কাফন পরিধান করে কবরস্থানে যায়। সেলাই কর্মটা মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। খোদা না করুক, যদি কোন অঘটন ঘটে বা বিধবা হয়ে যায়, তাহলে স্বীয় ঘরে বসে সেলাই কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। তিনটা বিষয় থেকে মেয়েদেরকে রক্ষা করা খুবই জরুরী-(১) অশ্লীল বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে (২) স্কুল-কলেজ পর্যায়ের সহ শিক্ষা থেকে এবং (৩) সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি থেকে। এ তিনটি বিষয় মহিলাদের জীবন বিধ্বংসী বিষতুল্য। বর্তমান মেয়েদের মধ্যে যে উচ্ছৃংখলতা, বিলাসিতা ও নিলর্জ্জতা পরিলক্ষিত হয়, এগুলো উপরোক্ত তিনটি কারণেই প্রধানতঃ হয়ে থাকে।

কতেক জ্ঞান পাপী সহ শিক্ষাকে উৎসাহিত করে ছেলেমেয়েদেরকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে। আটার বছরের কম বয়সী মেয়েদেরকে বিবাহ দিতে না পারে মত সরকারীভাবে আইন প্রণয়ন করেছে এবং ছেলেমেয়েদেরকে সিনেমা, থিয়েটার ও অশ্লীল বই, ম্যাগাজিন পড়ার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে দেশে হারাম কাজের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। অনেকে সৎপথে বাধাগ্রস্থ হয়ে কুপথে পা বাড়াচ্ছে। বর্তমান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল-হাকীকত দেখে মনে হয়, আমরা প্যারিসে বসবাস করছি। অবস্থা খুবই নাজুক। নিজের মেয়েদেরকে লজ্জাবতী ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। যেন ওদের সন্তানাদিতে এসব গুণাবলী প্রকাশ পায়। ডঃ ইকবাল বলেছেনঃ

بے ادب مان باادب اولاد جن سکتی نہین

معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہین

অর্থাৎ বেআদব মা চরিত্রবান সন্তান জন্ম দিতে পারে না। ইস্পাতের খনি থেকে স্বর্ণ বের হয় না।

অপছন্দনীয় প্রথাসমূহ

প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ ও এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। কার মৃত্যু কোথায় ও কখন হবে, তা কারো জানা নেই। এজন্য মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ও দাফনের মাসআলাসমূহ প্রত্যেক মুসলমানের জেনে রাখা প্রয়োজন। যেন প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো যায়। আজ কাল আমরা এ কাজকে অসম্মানজনক মনে করি। এটা একমাত্র মোল্লাদের কাজ মনে করে একে ঘৃণা করি। কিন্তু এটা আমার বুঝে আসে না যে কারো বাপ বা নিকট আত্মীয় মারা গেলে, ওকে যদি নিজ হাতে গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা হয়, এতে বেইজ্জতীর কি আছে? মৃত্যুর পর বাপকে স্পর্শ করাটা কি বেইজ্জতী?

কয়েক বছর আগের ঘটনা, নয়াদিল্লীতে পাঞ্জাবের অধিবাসী এক উচ্চ শিক্ষিত লোক মারা গিয়েছিল। পেশাদার কোন গোসল দানকারী না পাওয়ায়, ওর ছেলেরা ওকে অনেকক্ষণ গোসলবিহীন অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। বদাউন জিলায় জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুতে ওর ছেলেরা ফাতিহার আয়োজন করেছিল। মাহফিলে এমন লোকের জমায়েত হয়েছিল, যারা কুরআন পাক পড়তে জানতো না। ফলে মহাসমস্যার সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত ক্যাসেট প্লেয়ারে সুরা ইয়াসীনের ক্যাসেট বাজিয়ে এর ছওয়াব মৃত বাপের রুহে বখ্শীশ করা হলো। এ ঘটনাদ্বয় থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মুর্দার ও মীরাছের প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ জেনে রাখা খুবই প্রয়োজন। এসব মাসআলার জন্য 'বাহারে শরীয়ত' একান্ত সহায়ক কিতাব।

আমি এখানে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ওসব কুপ্রথাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, যেগুলো নাজায়েয ও অপব্যয় মাত্র। এ প্রথাগুলো দু'রকম-মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর।

মৃত্যুকালীন সময়ের প্রথাসমূহঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৃত্যুর সময় যেসব লোক উপস্থিত থাকে, ওরা দুনিয়াবী কথাবার্তায় মশগুল থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যুর পর কান্নার সময় অনেকে মুখ দিয়ে কুফরী শব্দও বের করে যেমন-'হায়রে আফ্সোস,. আল্লাহ অসময়ে নিয়ে গেল; আজরাইল ফিরিশতা জুলুম করলো, আজরাইল ফিরিশতা আমার ঘরটা দেখলো? ইত্যাদি। অনেক জায়গায় মৃত্যুর পর লাশকে ১/২ দিন রেখে দেয়া হয়। দূরের আত্মীয় স্বজন আসার জন্য অপেক্ষা করা হয়। এ রোগটা পাঞ্জাবে খুব বেশী। যে ঘরে লোক মারা যায়, সে ঘরের ও আশেপাশের লোকেরা লাশ দাফন করার আগ পর্যন্ত কিছু খায় না। লাশ ২/১ দিন পড়ে থাকলে, ক্ষুধায় জীবিতদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। দাফনের পর নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ খাবার নিয়ে আসে। তবে দাফনের অপেক্ষায় যেসব ঘরে খাবার তৈরী করা হয়নি, ওদের সবের জন্য খাবার আনতে হয়।ইউ,পির কোন কোন জায়গায় রাত্রে মহল্লাবাসীকে ঘুম থেকে উঠায়ে খাবার পৌছায়ে দেয়। বিবাহ শাদীর পান-সুপারী মিষ্টির মত কোন ঘরে এ খাবার না পৌছালে মারাত্মক বদনামী হয়।

পাঞ্জাবে এটাও প্রচলিত আছে যে, এক ডেকসি খাবার তৈরী করে কবরস্থানে নিয়ে যায় এবং দাফনের পর গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ইউ,পি-তে কাঁচা শস্য ও টাকা-পয়সা বন্টন করে থাকে।

এসব প্রথাসমূহের কুফলঃ মানুষের জন্য মৃত্যুর সময়টা হচ্ছে খুবই কঠিন সময়। ও সময় নিকট আত্মীয়দের দুনিয়াবী কথাবার্তা খুবই ক্ষতিকর। কেননা এর দ্বারা মৃতগামীর ধ্যানচ্যুত হতে পারে। চোখের পানি ফেললে, মৃদু আওয়াজ বের হলে কিংবা মুখ দিয়ে ধৈর্য সান্ত্বনা ইত্যাদির শব্দ বের হলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু বুক চাপড়ানো, মুখে করাঘাত করা, কাপড় ছেঁড়া, অধৈর্যের কথাবার্তা মুখ দিয়ে বের করা, বিলাপ করা হারাম। এটা অনুধাবন করা চায় যে বিলাপ বা বুক চাপড়ালে মৃত জীবিত হয় না বরং ধৈর্যে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, সেটা থেকেও বঞ্চিত হয়। আনন্দ ও দুঃখ-এ দু'সময় হচ্ছে পরীক্ষার সময়। এ দু'সময় অটল থাকার মধ্যেই রয়েছে কামিয়াবী। মছীবতের সময় এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, যে আল্লাহতাআলা আমাদেরকে সারা জীবন আরাম দান করেছেন, তিনি যদি কোন সময় দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকে, এর জন্য সবর করা উচিত।

দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনের আসার অপেক্ষায় মৃত ব্যক্তির দাফনে দেরী করা নিষেধ এবং এতে নানা ঝুঁকিও থাকে। অধিক্ষণ রাখার ফলে লাশ ফেটে গেলে বা কোন রকম দুর্গন্ধ বের হলে বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে এতে লাশের অবমাননা হয়। আত্মীয়-স্বজন এসেতো মুর্দারকে জীবিত করতে পারবে না এবং মুখ দেখেও বা কি করবে। এজন্য দাফনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন।

কয়েকটি বিষয়ে বিনা কারণে দেরী করা নিষেধ-মেয়ের বিবাহ, কর্জ আদায় করা, নামায পড়া, তওবা করা, মুর্দার দাফন করা, নেক কাজ করা ইত্যাদি।

কারো মৃত্যুতে পুরা মহল্লার জন্য খাবার তৈরী করা ও মহল্লাবাসীকে খাওয়ানো নিষেধ। অবশ্য মৃত ব্যক্তির একান্ত ঘনিষ্ঠগণ দাফন কাফনে নিয়োজিত ও অধিক শোকের কারণে খাবার তৈরী করে না বিধায় ওদের জন্য খাবার তৈরী করা ও ওদেরকে সাথে নিয়ে খাওয়া সুন্নাত। তবে এটা যেন স্মরণ থাকে যে, খাবার কেবল ওদের জন্য তৈরী করতে হবে এবং কেবল ওরাই খাবে, যারা অধিক শোক-দুঃখের কারণে ঘরে খাবার তৈরী করতে পারেনি। কুপ্রথা অনুসারে মহল্লাবাসীকে খাওয়ানো ও খাওয়া উভয়টা নাজায়েয। লাশের সাথে রান্না করা খাবার বা কাঁচা শস্য কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করার যে প্রথাটি ইউ,পিতে প্রচলিত আছে, এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে দু'টি কথা খেয়াল রাখা দরকার। একেতঃ লোকেরা সেটাকে যেন এমন অত্যাবশ্যক মনে না করে যে কর্জ করে হলেও করতে হবে এবং মৃত ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অনুপস্থিত ওয়ারীশের অংশ থেকে যেন এ দান করা না হয়। দ্বিতীয়তঃ কবর স্থানে এসব খাদ্য বন্টন করার সময় যেন গরীব-মিসকীনরা কবরসমূহ পদদলিত না করে এবং খাদ্যশস্য যেন নিচে না পড়ে। আমার মতে ঘরেই দান-খয়রাত করাটাই উত্তম। কেননা এটা দেখা গেছে যে, ফকীর মিসকীনরা অনেক সময় হুড়াহুড়ি করে কবর সমূহের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং অনেক খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলে।

মৃত্যুর সময় ইসলামী প্রথাসমূহ

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে নাক বাঁকা হয়ে যাওয়া এবং কান ও মাথার মাঝামাঝি অংশ বসে যাওয়া। এ লক্ষণ প্রকাশ পেলে রোগীকে অনতিবিলম্বে যেন কাবার দিকে মুখ করে শোয়ায়ে দেয়া হয় বা খাটকে কবরের মত উত্তর দক্ষিণ করে মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ করে রোগীকে ডান পাশ করে যেন রাখা হয়। এতে কিন্তু প্রাণ বের হবার সময় একটু কষ্ট হয়। রোগীকে কাবার দিকে পা করে চিৎ করে শোয়ানোটাই উত্তম যেন কাবার দিকে মুখ থাকে। তখন এক পাশ করার প্রয়োজন হয় না। কয়েক অবস্থায় কাবার দিকে পা করা জায়েয-(১) শোয়াবস্থায় নামায পড়ার সময় (২) প্রাণ বের হবার সময় (৩) মৃতকে গোসল দেয়ার সময় এবং (৪) কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময়। যাক মৃত প্রায় ব্যক্তিকে উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব পশ্চিম করে শোয়ায়ে উপস্থিত সবাই রোগী শুনে মত আওয়াজ করে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করবে এবং কেউ ওর মুখে পানি

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিতে থাকবে। কেননা ওই সময় খুবই তৃষ্ণা বোধ হয়। গরমকাল হলে যেন পাখা করা হয়। যাদের কুরআন শরীফ জানা আছে, তারা যেন মৃত্যু কষ্ট আসান হওয়ার জন্য সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে এবং এ দুআ করে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

(হে আল্লাহ আমরা সবাইকে শুভ সমাপ্তির তৌফিক দান করুন)

যখন প্রাণ বের হয়ে যায়, তখন কাউকে যেন কান্না থেকে বাধা দান করা না হয়। কেননা অধিক শোকে কান্নাকাটি না করলে জঘন্য রোগের সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য বিলাপ করা থেকে বাধা দেয়া উচিত।

গোসল ও কাফনের পর নাত পাঠ বা উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ ও কলেমা পাঠ করে মুর্দারকে কবরস্থানে নিয়ে যাবে। কেননা আজকাল উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির করে না গেলে লোকেরা দুনিয়াবী গল্পগুজবে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া নাত পাঠ ও দরূদ শরীফের আওয়াজ দ্বারা লোকেরা বুঝতে পারে যে কোন জানাযা যাচ্ছে, তখন ওরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এসে জানাযায় ও দাফনে শরীক হয়। জানাযার নামাযের পর প্রত্যেকে কমপক্ষে তিনবার সুরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে ছওয়াব বখশীশ করে দিবে। জানাযার নামাযের পর দুআ করা সুন্নাত। (আমার রচিত জাআল হক দেখুন)

দাফনের কাজ শেষ করার পর কবরের শিয়রে সূরা বকরার শুরুর আয়াতসমূহ এবং কবরের পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষ রুকু পাঠ করে মুর্দারকে সওয়াব বখশীশ করে দিবেন। দাফন করে ফিরে আসার সময় মুর্দারের শিয়রে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া উত্তম। এতে কবর আযাব সহজ হয় এবং মুর্দারের কাছে মনকির নকিরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ আসে।

মৃত্যুর পরবর্তী প্রচলিত কুপ্রথা সমূহ

মৃত্যুর পর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রথা পালিত হয়। তবে এমন কতেকগুলো প্রথা যেগুলো সামান্য তারতম্য সহকারে প্রায় জায়গায় প্রচলিত আছে। আমি এখানে কেবল সেগুলোই উল্লেখ করছি।

বধুর কাফনের কাপড় ওর মা-বাবাকে দিতে হয়। হয়তো কাপড় খরিদ করে নিয়ে আসতে হয় অথবা পরে কাপড়ের দাম দিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর তিনদিন পর্যন্ত সমস্ত খরচ মেয়ের মা-বাপকে করতে হয়। মেয়ের ঘরের সন্তানদের

কাফনের খরচও মেয়ের মা-বাপকে বহন করতে হয়। মৃত্যুর পরবর্তী তিন দিন মোট ছয় বেলা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে বিশেষ করে মেয়ের বাপের বাড়ী থেকে খাবার পাঠাতে হয় যেন পাড়া-পড়শী সহ সবাই তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। কমপক্ষে ৪০/৫০ জনের খাবার পাঠাতে গেলে ২/৩ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুর্দারের গৃহবাসীর উপর চতুর্থ দিনের জিয়াফত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন পাড়া-পড়শী ধনী গরীব সবাইকে দাওয়াত দিতে হয়। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিধবা স্ত্রী, বৃদ্ধ মা-বাপের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে ওর পরিত্যক্ত সম্পদ খরচ করে এ ধরনের জিয়াফতের আয়োজন করে থাকে। অনেক জায়গায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক দু'টি রুটি দান করা হয়। আবার এর মাঝখানে ১০, ২০ ও ৪০ দিনের জিয়াফত মহা ধুমধামে পালন করা হয়। তখনও পাড়া পড়শীকে দাওয়াত দিতে হয়। চতুর্থ দিনের ফাতিহার সময় নানা রকম মিষ্টি, ফলমূল একত্রিত করে ফাতিহা দেয়ার পর এগুলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় এবং এক জোড়া নতুন কাপড় খরিদ করে দান করা হয়। এরপর ছয় মাসিক ও বার্ষিক ফাতিহাও করে থাকে। তখনও পাড়া-পড়শী ও আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াতে হয়। অনেকে এসব কাজ নাম প্রচারের জন্য করে থাকে। অনেকে নাক কাটা যাবার ভয়ে করে থকে।

এসব প্রথাসমূহের কুফলঃ শরীয়তের বিধান মতে কাফনের দায়িত্ব ওই ব্যক্তির হয়ে থাকে, জিন্দেগীতে যার উপর এর ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে এবং ছোট ছেলেমেয়েদের কাফন ওদের মা-বাপের দায়িত্বে থাকে। যুবতী মেয়েদের কাফনের দায়িত্ব বিবাহের আগে বাপের এবং বিবাহের পর স্বামীর হয়ে থাকে। স্বামীর জীবিতাবস্থায় বাপ-ভাই থেকে বাধ্যগতভাবে কাফনের কাপড় আদায় করা জুলুম এবং নিষেধ।

মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয় স্বজন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য. কেবল দু'বেলার খাবার প্রেরণ করা সুন্নাত। এ খাবার কেবল ওদের জন্য, যারা শোক ও ব্যস্ততার কারণে খাবার তৈরী করতে পারেনি। এ খাবারে পাড়া-প্রতিবেশীর কোন হক নেই বরং ওদের জন্য এ খাবার নিষেধ। অবশ্য মৃত ব্যক্তির ঘরে দূর থেকে আগত মেহমান এ খাবার খেতে পারে। একদিনের অধিক খাবার প্রেরণ করা নিষেধ। মৃত ব্যক্তির পরিবার থেকে কুলখানি ও চেহলামের খাবার আদায় করা পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য হারাম ও মকরূহ তাহরীমী। সুতরাং প্রচলিত কুলখানি, দশমী, চেহলাম, ছয় মাসিক ও বার্ষিক ফাতিহায় পাড়া-প্রতিবেশী ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ার জন্য দাওয়াতকারী ও দাওয়াত গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার। এ খাবার কেবল গরীব মিসকিনদের হক। কেননা এটা এক প্রকার সাদকা। মৃত ব্যক্তির ওয়ারীশগণের মধ্যে শিশু বা কেউ বিদেশে থাকলে সম্পত্তি বন্টন করার আগে সেই সম্পদ থেকে দান খয়রাতও হারাম। তাই মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারীশ ইচ্ছে করলে নিজের সম্পদ থেকে মৃত ব্যক্তির নামে দান খয়রাত করতে পারে অথবা সম্পদ বন্টন করার পর নিজের ভাগ থেকে দান-খয়রাত করতে পারে। মৃত ব্যক্তির জিয়াফত সম্পর্কে উপরে যা বর্ণিত হলো, তা হলো শরীয়তের বিধান। এবার দুনিয়াবী অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তখন বুঝতে পারবেন, এসব কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি প্রচলিত কুপ্রথা অনুসারে পালন করতে গিয়ে কত যে পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি নিজের চোখে এমন অনেক পরিবারকে দেখেছি, যাদের জায়গা জমি ঘর-বাড়ী কুলখানি, চেহলামের বদৌলতে হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি বাপের চেহলামের জন্য এক হিন্দু মহাজন থেকে চার হাজার টাকা সুদী কর্জ নিয়েছিল। সাতাশ হাজার টাকা আদায় করার পরও কর্জ শোধ হয়নি।

অতএব, এসব কুপ্রথাগুলো কঠোর হস্তে বন্ধ করে দেয়া একান্ত আবশ্যক।

মৃত্যুর পরবর্তী ইসলামী প্রথা সমূহ

ইসলামের বিধান হচ্ছে দাফন কাফনের খরচ হয়তো মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে করবে অথবা কারো স্ত্রী মারা গেলে স্বামী এবং শিশু মারা গেলে বাপ খরচ বহন করবে। স্বামীর বর্তমানে মেয়ের বাপ থেকে দাফন কাফনের খরচ আদায় করা কখনো ইসলাম সম্মত নয়। কেবল শোকার্ত পরিবারের জন্য প্রথম দিন প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয় খাবার নিয়ে যাবে এবং মনে মনে সুন্নাতের নিয়ত করবে, পার্থিব নাম দামের কোন খেয়াল যেন না থাকে। মৃত ব্যক্তির পুরুষ সদস্য যদি শোক প্রকাশের জন্য তিনদিন কোন এক জায়গায় বসে থাকে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে গল্প গুজবের পরিবর্তে দুআ-দরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকাই উত্তম। কুলখানি, চেহলাম, বছরী ফাতিহা ইত্যাদি নিশ্চয় করা চাই। তবে এটা খেয়াল রাখা দরকার যে এসব উপলক্ষে তৈরীকৃত খাবার যেন গরীব মিসকনকে খাওয়ানো হয়। প্রচলিত রেওয়াজ মতে পাড়া-পড়শীকে খাওয়ানো কখনো উচিত নয়। গরীব-মিসকিনদের জন্যও নিজের সামর্থ অনুযায়ী খরচ করবে, কর্জ নিয়ে এসব কাজ আঞ্জাম দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কর্জ করে হজ্ব

করা এবং যাকাত দেয়াও নাজায়েয। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আলা হযরতের جلى الصوت لنهى الدعوة عن اهل الموت নামক কিতাবখানি দ্রষ্টব্য)

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আলা হযরত কোন মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গেলে পানও গ্রহণ করতেন না। একবার কোন একজন বললেন, হুযুর, এটাতো দাওয়াতের পান না, কেবল ভদ্রতা মাত্র। এটা গ্রহণ করলে ক্ষতি কি? আলা হযরত বললেন, সর্দি দমন কর, যেন জ্বর থেকে রেহাই পাও। আমার উপরোক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়া নয়। বন্ধ করার কথাতো দেওবন্দী ওহাবীরাই বলে থাকে। আমার অভিপ্রায় হচ্ছে শরীয়ত বিরোধী ও বেহুদা কু প্রথাগুলো বাদ দিয়ে যেন ইসলামসম্মত কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি করা হয়।

মীরাছঃ ইসলামী বিধান মতে মুসলমানের সকল সন্তান-ছেলেমেয়ে নিজের মা-বাপের মৃত্যুর পর ওদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মীরাছ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করে। ছেলে পায় মেয়ের দ্বিগুণ। হিন্দু ও আর্য ধর্মে মেয়েরা মা বাপের সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং সব সম্পদ ছেলেরাই পেয়ে থাকে। এটা সুস্পষ্ট জুলুম। যখন উভয় একই বাপের সন্তান, তখন একজন পাবে, আর একজন পাবে না, এটা কোন্ ধরনের বিধান? দুঃখের বিষয়, কাটিয়াওয়ার্ড ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা নিজেদের জন্য হিন্দুদের এ বিধান পছন্দ করেছে এবং সরকারকে লিখিত অভিমত দিয়েছে যে ওদের কাছে হিন্দুয়ানী বিধানই গ্রহণযোগ্য। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে আমরা জিন্দেগীতে মুসলমান এবং মৃত্যুর পর নাউজুবিল্লাহ হিন্দু। স্মরণ রাখবেন, কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী বিধানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা কুফরী। যদি জেনে শুনে সে আনুসারে আমল না করে, তাহলে সেটা হক আত্মসাৎ ও জুলুম হিসেবে বিবেচ্য। ছেলে তোমার কি লাভ করলো এবং মেয়ে কি ক্ষতি করলো? যখন তুমি মারা যাবে, তখন তোমার সম্পত্তি যেই গ্রহণ করুন না কেন, তোমার কি আসে যায়? ছেলের মায়ায় বিভোর হয়ে কেন স্বীয় পরকালকে ধ্বংস করছ? তোমাদের এ ধারণাটাও ভুল যে মেয়েরা সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলে। আমিতো দেখেছি যে মা-বাপের জিনিসের প্রতি মেয়েদের যে দরদ, তা ছেলেদের থাকে না। তাছাড়া মেয়েরা মা-বাপের বার্ধক্যের সময় যতটুকু খেদমত করে, ততটুকু ছেলেরা করে না। এরপরও ওদেরকে বঞ্চিত করার কেন চিন্তা ধারণা? ওদের প্রাপ্য অংশ ওদেরকে দেয়া একান্ত জরুরী। কাটিয়াওয়ার্ডে আগাখানি খোজা নামে একটি সম্প্রদায় বাস করে। যদি ওদের কারো দু'ছেলে হয়, তাহলে একটার নাম কাসেম এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপরটির নাম রাম লাল রাখে এবং বলে যে কিয়ামতের দিন যদি মুসলমানদের মাগফিরাত হয়, তাহলে কাসেম আমাদের গুনাহ মাফ করায়ে নিবে আর যদি হিন্দুরা নাজাত পায়, তাহলে রামলাল আমাদের সহায় হবে। আমরাও কি ওদের অনুসরণে জিন্দেগীতে ইসলামী বিধান এবং মীরাছের বেলায় হিন্দুয়ানী বিধান গ্রহণ করেছি? যদি কোন মুসলমানের এ রকম সন্দেহ হয় যে, ওর মৃত্যুর পর ওর সন্তানেরা ওর জায়গা জমি, ঘরবাড়ী বিনষ্ট করে ফেলবে, তখন ইচ্ছে করলে সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে যেতে পারে। এর সুফল হচ্ছে, সম্পদ ভোগ করতে পারবে, কিন্তু বিক্রি করতে পারবে না। ইনশা আল্লাহ তখন সম্পতি হাত ছাড়া হবে না এবং গুনাহ থেকেও রক্ষা পাবে। মুসলমানেরা আগ থেকে যদি এ নিয়ম অনুসরণ করতো, তাহলে আজ ওদের অনেক জায়গা জমি হিন্দুদের হাতে চলে যেত না। মীরাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত 'ইলমুল মীরাছ' অধ্যয়ন করুন।

দৈনন্দিন জীবনে উপকারী অজিফা ও আমলসমূহ

আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শে আমি কয়েকটি অতি জরুরী ও ফলপ্রসূ আমলের কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি, যা আমার মুর্শেদে বরহক হযরত সদরুল আফাজেল মাওলানা মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর পক্ষে থেকে অনুমতি পেয়েছি এবং আমি খাস আল্লাহর ওয়াস্তে সুন্নী মুসলমানদেরকে এর অনুমতি দিচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ-নিম্নের প্রত্যেক আমলের সফলকামের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে-এক. সঠিক সুন্নী আকীদার বিশ্বাসী হতে হবে এবং প্রত্যেক বদমাযহাব বিশেষ করে দেওবন্দী ও ওহাবীর সংশ্রব থেকে বিরত থাকতে হবে। দুই. শরয়ী আহকাম বিশেষ করে নামায-রোযার একান্ত অনুসারী হতে হবে। রোগীর শুধু অষুধ সেবন করলে কাজ হয় না। বরং কুপথ্য থেকেও বিরত থাকতে হয়। নিম্নে বর্ণিত আমলগুলোর বেলায়ও উপরোক্ত শর্ত দু'টি পালন না করলে কোন কাজ হবে না। নিম্নে দু'ধরনের অজিফা ও আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে-কতেকগুলো দৈনন্দিন ও বিশেষ সময়ের জন্য আর কতেকগুলো বিশেষ রাত ও তারিখের জন্য।

সকাল-সন্ধ্যায় ঃ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর প্রতিদিন তিনবার নিম্নের দু'আটি আগে পরে তিনবার দরূদ শরীফ সহ পড়বেনঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامّٰتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

এরপর পড়বেনঃ

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহতাআলা বিষাক্ত প্রাণী-সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রাখবে। এটা পরীক্ষিত।

দৈনিক ভোরেঃ ফজরের সুন্নাত নিজ ঘরে পড়বেন। অতঃপর আগে পরে তিনবার দরূদ শরীফ সহ সত্তর বার এ দুআ টি পড়বেনঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

এতে ঘরের মধ্যে অনেক বরকত হবে এবং খোদার ফজলে ঘরের সবাই মিলেমিশে থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, পুরুষ ফজরের ফরয যেন জমাত সহকারে মসজিদে পড়ে।

খাবার গ্রহণ করার সময়ঃ খাবার যখন সামনে আনা হয়, তখন এ দু'আটি পড়ে খাবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

ইনশা আল্লাহ সেই খাবার কোন ক্ষতি করবে না। অষুধ সেবন করার সময়ও এ দুআটি পড়ে নেয়া উচিত।

শত্রুদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্যঃ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা আগে-পড়ে দরূদ শরীফ পড়ে তিনবার এ দু'আটি পড়বেন। ইন্‌শাআল্লাহ শত্রুদের শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ-

সফরে বের হবার সময়ঃ যদি মকরূহ ওয়াক্ত না হয় (নফলের জন্য মকরূহ ওয়াক্ত হচ্ছে ফজর ও আছরের পর এবং দ্বিপ্রহরের সময়) তাহলে সফরের নিয়তে দু'রাকাত নফল নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে তিনবার সূরা ইখলাস পড়বেন এবং এ দুআটি পড়বেনঃ

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোদার রহমতে সাহীহ সালামতে ঘরে ফিরে আসবেন এবং সবাইকে সহীহ সালামতে পাবেন। যদি ওই সময় নফলের জন্য মকরূহ সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে কেবল উপরোক্ত দুআটি পড়বেন।

বাহনের উপর আরোহন করার সময়ঃ যদি স্থলযান হয়, তাহরে এ দুআটি পড়বেনঃ-

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

ইনশা আল্লাহ বাহনে কোন কষ্ট হবে না এবং সব রকম বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন। যদি নৌযান হয়, তাহলে এ দুআটি পড়বেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ-

ইনশা আল্লাহ ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবেন।

রাত্র শোয়ার সময় (১) যদি আয়াতুল কুরসী পড়ে নেয়া হয়, তাহলে সারারাত সেই ঘর চুরি, আগুন ও আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং পাঠকারী খারাপ স্বপ্ন ও জ্বিনের অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকবে। প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ শুভ সমাপ্তি হবে। (২) যে ব্যক্তি প্রতি রাত শোয়ার সময় পাঁচ কলেমা ও সুরা কাফেরুন পাঠ করে নিদ্রা যায়, ইনশা আল্লাহ মৃত্যুর সময় ওর কলেমা নছীব হবে। তবে উক্ত আয়াত পাঠ করার পর যেন কোন দুনিয়াবী কথা না বলে।

প্রতি নামাযের পর ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ.... রুকুর শেষ পর্যন্ত পড়ে নেয়া হলে, অদৃশ্য থেকে রুজি লাভ করবে এবং অনেক বরকত হবে।

বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে এ দুআটি পাঠ করবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰى كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا

ইনশাআল্লাহ সেই মছীবতে নিজে কখনো পড়বে না।

বার মাসের বরকতময় দিনসমূহের আজিফা ও আমল সমূহ

মুহরমের নয় ও দশ তারিখে রোযা রাখলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। ১০ই মুহরম ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল ভাল খাবার তৈরী করা হলে ইনশা আল্লাহ সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। ওই দিন খিচুরী তৈরী করে হযরত শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহতাআলা আনহু) এর নামে ফাতিহা দেয়াটা খুবই উত্তম। ওইদিন গোসল করলে ইনশা আল্লাহ সারা বছর রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা এ দিন জমজম কূপের পানি সমস্ত পানিতে পৌছে। (তফসীরে রুহুল বয়ান, বার পারা নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী দ্রষ্টব্য)

১০ই মুহররম সুরমা লাগালে ইনশা আল্লাহ সারা বছর চোখ সুস্থ থাকবে। (দুর্রুল মুখতাব কিতাবুস সওম)

১২ই রবিউল আউয়াল হুযুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র বেলাদতের আনন্দে রোযা রাখা খুবই ছওয়াব। কিন্তু লাগাতার দু'রোযা রাখা উত্তম। এ মাসে মিলাদ মাহফিল করলে সারা বছর ঘরে বরকত থাকে এবং সর্বতোভাবে নিরাপদ থাকে। (রূহুল বয়ান)

এটা একান্ত পরীক্ষিত যে এগার ও বার তারিখের মধ্যবর্তী রাতে গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করে ও সুগন্ধি লাগায়ে পবিত্র বেলাদতের আনন্দে সারা রাত জেগে থাকা এবং ঠিক সুবহে সাদেকের সময় কিয়াম-সালামের পর যেকোন নেক দু'আ প্রার্থনা করলে ইনশা আল্লাহ কবুল হবে। তবে এতে পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে এবং মিলাদ কিয়াম ঠিক সময়ে হতে হবে।

রবিউল আখেরের ১১ তারিখ হুযুর গাউছে পাক সরকারে বাগদাদের ফাতিহা খুবই বরকতময়। সারা বছর এর বরকত থাকে। যদি প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাত্রে নির্দিষ্ট টাকার মিষ্টান্ন মুসলিমের দোকান থেকে ক্রয় করে বা ঘরে তৈরী করে নিয়মিতভাবে গিয়ারবী শরীফের ফাতিহা দেয়া হয়, তাহলে রিযিকের মধ্যে খুবই বরকত হয় এবং কখনো পেরেশানী অবস্থায় পতিত হবে না। তবে শর্ত হলো যে, নিয়মিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট টাকার কম বেশী করা

যাবে না। স্বয়ং আমি এর যথাযথ আমলকারী এবং খোদার ফজলে অগনিত উপকার লাভ করি।

রজব মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা খুবই ফযিলতময়। এ তিন রোযাকে হাজারী রোযা বলা হয়। কেননা এটা খুবই প্রসিদ্ধ যে এ তিন রোযায় হাজার রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। ২২শে রজব ইমাম জাফর ছাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ফাতিহা করা হলে, অনেক আগত মছীবত দূরীভূত হয়ে যায়।

২৭শে রজব মেরাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, সারা রাত জেগে নফল ইবাদত করা খুবই উত্তম। পাঞ্জাবে রজব মাসে যাকাত প্রদান করে। অবশ্য ধন-সম্পদের বছর পূর্ণ হলে, রজবের জন্য অপেক্ষা না করে সাথে সাথে যাকাত দিয়ে ফেলা উচিত। বছর পূর্ণ হবার আগেও যাকাত দেয়া যায়। রমযান মাসে যাকাত দেয়াটা খুবই উত্তম। কেননা রমযান মাসে নেক কাজের ছওয়াব অধিক।

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতকে শবে বরাত বলা হয়। এটি খুবই মুবারক রাত। এ রাতে কবরস্থানে যাওয়া ও ওখানে ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। বুর্জুগানে দীনের মাযারে উপস্থিত হওয়া ছওয়াবের কাজ। ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখতে পারলে ভাল। ১৫ তারিখ হালুয়া রুটি তৈরী করে ফাতিহা দেয়ার পর সদ্‌কা-খয়রাত করে দেয়া খুবই উত্তম কাজ। ১৫ তারিখের সারা রাত যেন নফল ইবাদতে অতিবাহিত করে। ওই রাতে প্রত্যেক মুসলমান একে অপর থেকে স্বীয় অপরাধ মাফ করায়ে নেয়া এবং কর্জ ইত্যাদি আদায় করা উচিত। কেননা ঈর্ষা পরায়ণ মুসলমানের দুআ কবুল হয় না। সেই রাতে দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে একশ রাকাত নফল নামায পড়া উত্তম। প্রতি রাকাতে যেন একবার সুরা ফাতিহা এবং ১১ বার সুরা ইখলাস পড়া হয়। এর বদৌলতে আল্লাহতাআলা সমস্ত হাজত পূর্ণ করবেন এবং গুনাহ মাফ করবেন। (তফসীরে রুহুল বয়ান সুরা দুখান দ্রষ্টব্য) সারা রাত জেগে থাকা সম্ভব না হলে যত দূর সম্ভব যেন ইবাদতে মশগুল থাকে এবং কবর যিয়ারত করে। মহিলাদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। সুতরাং তারা নফল ইবাদত ও রোযা রাখবে। যদি সেই রাত্রে সাতটি কুলপাতা পানিতে সিদ্ধ করে গোসল করে, তাহলে ইনশা আল্লাহ সারা বছর যাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

পবিত্র রমযান মাসের প্রতিটি মুহূর্ত অগণিত বরকতে ভরপুর। এর প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে অতিবাহিত হয়। দিনে রোযা ও তিলাওয়াতে কুরআন এবং

রাতে তারাবীহ ও সেহরীতে অতিবাহিত হয়। এ মাসে শেষ জুমার দিন এবং সাতাশ তারিখের রাত খুবই বরকতময়। এর কিছু আমল নিম্নে বর্ণিত হলো।

রমযান মাসের সাতাশ তারিখ রাত খুব সম্ভব শবে কদর। এ রাত জেগে অতিবাহিত করা উচিত। যদি সারা রাত জেগে থাকতে না পারে, তাহলে কমপক্ষে সেহরী খাওয়ার পর না শোয়া উচিত। এ দুআটি অধিকভাবে পড়া উচিত-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِی الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

পারলে দু' দু' রাকাতের নিয়'ত করে যেন একশ' রাকাত নফল নামায পড়ে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সুরা কদর ও তিনবার সুরা ইখলাস যেন পাঠ করে এবং প্রত্যেক সালামের পর যেন কমপক্ষে দশবার দরূদ শরীফ পড়ে। সাতাশ তারিখের রাতে তারাবীহের নামাযে কোরান খতম করাটাও উত্তম। (তফসীরে রুহুল বয়ান, সুরা কদর দ্রষ্টব্য)

রমযানের শের জুমার দিন ওমরী কাযার নামায পড়াটা খুবই উত্তম। এর নিয়ম হচ্ছে, জুমার নামাযের পর আছরের আগে দু' দু' রাকাতের নিয়ত করে বার রাকাত নফল পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার সুরা ইখলাস, একবার সুরা ফলক ও একবার সুরা নাস পড়বে। এর ফায়দা হচ্ছে, যে পরিমাণ নামায কাযা হয়েছে, সেগুলো কাযা করার গুনাহ ইনশাআল্লাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে কাযা নামায মাফ হয়ে যাবে না। সেটা তো পড়ার পরই আদায় হবে। উভয় ঈদের রাত্রেও ইবাদত করাটা বড় ছওয়াব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমান ও বেকারত্ব

মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো বেকারত্ব ও অকর্মন্যতা। বেকারত্বের কারণে অভাবগ্রস্থ, অভাবগ্রস্থের কারণে ঋণগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্তের কারণে হতে হয় অপদস্ত। অভাবগ্রস্ততা অনেক অপরাধের মূল। চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, মস্তানি ইত্যাদি প্রধানতঃ বেকারত্ব ও অভাবগ্রস্তের কারণেই হয়ে থাকে। দারিদ্রের হার মুসলমানদের মধ্যে সবচে' বেশী। নির্লজ্জের মত যেখানে সেখানে হাত পাততে দ্বিধাবোধ করে না। অনেক ধর্ম ব্যবসায়ী পেশাদার ওয়ারেজকে দেখা যায়, ওয়াজ করার পর শ্রোতাদেরকে বলে-'ভাইগণ আমি একজন গরীব লোক, আমাকে সাহায্য করুন। এ দু'টি শব্দে সম্পূর্ণ ওয়াজ বেকার হয়ে যায়। অভাবের কারণে নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) খুব সুন্দর বলেছেনঃ

غم اهل وعيال وجامه وقته بازت أرد زسير در ملكوت!

شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فسر زندم

অর্থাৎ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের চিন্তা ইবাদতকারীকে আধ্যাত্মিক জগতের ভ্রমণ থেকে টেনে নিচে নিয়ে আসে। নামাযের নিয়ত বাঁধা মাত্রই স্মরণ হয় যে কাল সকালে ছেলেরা কি খাবে।

এজন্য বেকারত্বের অবসান ঘটানো এবং নিজ নিজ ছেলেদেরকে বখাটে হওয়া থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত। যুবকদেরকে যে কোন কাজে নিয়োজিত রাখা উচিত। অন্যান্য জাতি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হিন্দুদের ছোট ছেলেমেয়েদেরকে হয়তো স্কুল-কলেজে অথবা রাস্তাঘাটে ছোটখাট জিনিসপত্র ফেরি করে বিক্রি করতে দেখা যায়। মুসলমানের ছেলেদেরকে হয়তো ঘুড়ি উড়াতে অথবা অন্যান্য খেলাধুলায় ব্যস্ত দেখা যায়। অন্যান্য জাতির যুবকদেরকে অফিস-আদালতের বিভিন্ন চেয়ারে বা ব্যবসায় ব্যস্ত দেখা যায়। কিন্তু মুসলমানের যুবকদেরকে ফ্যাশন বিলাসিতা ইত্যাদিতে মগ্ন অথবা চাঁদাবাজি, মস্তানি ইত্যাদি কাজে দেখা যায়। রংবাজি, ধোঁকাবাজি, খুন-খারাবি, ছিনতাই,

মোট কথা অধঃপতনের সব গুণ মুসলমান জাতির মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়েছে। মদখোর, জুয়াড়ী, সন্ত্রাসী ইত্যাদির মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। আফসোস, যে দ্বীন অসৎ-বদমাইশদেরকে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করতে এসেছে, সে দ্বীনের অনুসারীরা আজ বদমাইশদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী।

এত কিছুর পরও আমাদের টিকে থাকা ও আমাদের উপর আল্লাহর গজব না আসার একমাত্র কারণ হলো আমরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতাআলা ফরমায়েছেনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(অর্থাৎ হে মাহবুব, আপনি ওদের মধ্যে যতক্ষণ আছেন, আল্লাহর কাজ নয় যে ওদের প্রতি আজাব নাযিল করা)। তা নাহলে আমাদের পরিণতি খুবই মারাত্মক হতো। আগের উম্মতগুলোকে যে ধ্বংস করা হয়েছিল, তা মাত্র এক একটি অপরাধের কারণে। যেমন শুয়াইব আলাইহিস সালামের উম্মত ওজনে কম দেওয়ার কারণে, লুত আলাইহিস সালামের উম্মত হারাম কাজের কারণে ওদের প্রতি খোদার গজব নাযিল হয়েছিল। কিন্তু আমরা এমন সব কাজ করিতেছি, যা ওদের বাপদাদারা কল্পনাও করেনি। দুধ থেকে ননী বের করে নেয়া, ডালডাকে খাঁটি গাওয়া ঘিতে পরিণত করা, সরিষার তৈলের সাথে সয়াবিন তৈল মিশ্রিত করা, দেশী কাপড়কে বিদেশী সীল মেরে বিক্রি করা, মোট কথা যত জালিয়াতি আছে, সব ব্যাপারে আমরা পটু। এখনও সময় আছে, সতর্ক হয়ে যান। অনতিবিলম্বে এসব থেকে তওবা করে হালাল কাজকর্ম শুরু করুন। আমি নিম্নে বেকারত্বের কুফল ও হালাল উপার্জনের ফযীলতসমূহ দলিল ও যুক্তি সহকারে পেশ করছিঃ

হালাল উপার্জনের ফযীলত সমূহ

(১) হুযুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন-সবচে' উত্তম খাদ্য হচ্ছে সেটা, যা মানুষ স্বীয় হাতের উপার্জন দ্বারা খায়। হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাউদ আলাইহিস সালামও স্বীয় উপার্জন থেকে খেতেন। (বোখারী ও মিশকাত উপার্জন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, পবিত্র জিনিস হচ্ছে সেটা, তা তুমি স্বীয় উপার্জন থেকে খাও এবং তোমার সন্তানেরাও তোমার উপার্জন অর্থাৎ মা-বাপ সন্তানদের উপার্জন খেতে পারে। (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

(৩) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, এমন এক যুগ আসবে, যে সময় টাকা-পয়সা ছাড়া কোন কাজ হবে না।

(৪) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, হালাল উপার্জন ফরযের পর ফরয। (বায়হাকী) অর্থাৎ নামায রোযার পর হালাল উপার্জন ফরয।

(৫) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, আল্লাহতাআলা মুসলমানদেরকে সেই জিনিসের হুকুম দিয়েছেন, যেটার হুকুম নবীগণকে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহতাআলা নবীগণকে সম্বোধন করে ফরমায়েছেন-

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

(হে রসুলগণ, হালাল রিজিক উপার্জন করুন এবং নেক আমল করুন)। এবং মুসলমানগণকে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

(হে মুসলমানগণ, আমার প্রদত্ত হালাল জিনিসমূহ খাও)।

(৬) অনেক লোক হাত প্রসারিত করে একান্ত বিনীতভাবে দু'আসমূহ প্রার্থনা করে। অথচ ওদের খাদ্য ও পোষাক হারাম উপার্জনের হয়ে থাকে। তাই ওদের দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে। (মুসলিম)

(৭) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, তিন ধরনের লোক ব্যতীত অন্য কারো ভিক্ষা করা নাজায়েয। এক, যে কোন কর্জগ্রহীতার জামিন হয়েছিল এবং সেই কর্জ ওকে দিতে হচ্ছে। দুইঃ যার সম্পদ দৈব ঘটনায়

বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনঃ যে অভাবের কারণে উপবাস থাকছে। এ তিন ধরনের লোক ব্যতীত অন্যদের ভিক্ষা করা হালাল নয়। (মুসলিম, মিশকাত, যাকাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৮) একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এক আনসারী ভিক্ষা চাইলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেনঃ তোমার ঘরে কিছু আছে? আরয করলো, মাত্র একটি কম্বল আছে, যেটি অর্ধেক বিছিয়ে অর্ধেক গায়ে দি এবং একটি পেয়ালা আছে, যেটা দিয়ে পানি পান করি। ফরমালেন, সে দু'টা নিয়ে এসো। সে নিয়ে আসলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত সাহাবাগণকে সম্বোধন করে ফরমালেন, এ দু'টা খরিদ করার কে আছে? একজন আরয করলেন, আমি এক দিরম্ দিয়ে নিতে রাজি আছি। পুনরায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, এক দিরম থেকে অধিক দিতে রাজি কে আছে? অন্য একজন আরয করলেন, আমি দু'দিরম দিয়ে খরিদ করতে রাজি আছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) জিনিস দু'টা ওনাকে দিয়ে দিলেন (নিলাম প্রমাণিত হলো) এবং দিরম দু'টি সেই ভিক্ষুককে দিয়ে ফরমালেন, এক দিরমের খাদ্যশস্য ক্রয় করে ঘরে রেখে এসো এবং অপর দিরম দিয়ে একটি কুড়াল ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে এসো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ পবিত্র হাতে সেই কুড়ালে হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং ফরমালেন-যাও, লাকড়ী কেটে বিক্রি কর এবং পনের দিন পর আমার সাথে দেখা কর। নির্দেশমত সে আনচারী পনের দিন পর্যন্ত লাকড়ী কেটে বিক্রি করলো এবং পনের দিন পর বারগাহে নববীতে হাজির হলো। তখন ওর কাছে খাওয়া-দাওয়া বাবত খরচের পর দশ দিরম অবশিষ্ট ছিল। সেই টাকার কিছু অংশ দিয়ে কাপড় এবং কিছু অংশ দিয়ে খাদ্যশস্য ক্রয় করলো। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওকে ফরমালেন, তোমার জন্য এ কষ্ট ভিক্ষা থেকে উত্তম। (ইবনে মাযা, মিশকাত, যাকাত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(৯) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-হযরত আবু যর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ফরমালেন, তোমরা লোকদের থেকে কিছু প্রার্থনা কর না। আরয করলেন, খুবই ভাল। পুনরায় ফরমালেন, যদি ঘোড়ার উপর থেকে তোমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাবুক নিচে পড়ে যায়, তাহলে সেটাও উঠায়ে দেয়ার জন্য কাউকে বল না, নিজে নেমে উঠায়ে নও। (আহমদ, মিশকাত)

(১০) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, যে ব্যক্তি ভিক্ষা না করার জিম্মাদার হয়ে যায়, আমি ওর জন্য জান্নাতের জিম্মাদার। (নসাঈ, আবু দাউদ)

(১১) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, যে ব্যক্তি নিজের অভাব অনটনের আর্জি বান্দার কাছে পেশ করে, আল্লাহতাআলা ওর অভাব অনটন বৃদ্ধি করেন।

যুক্তির আলোকে উপার্জনের উপকারিতা

(১) হালাল উপার্জন নবীগণের সুন্নাত, (২) উপার্জনের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধিত সম্পদ দান-খয়রাত, হজ্ব-যাকাত, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যায়। হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) সম্পদের মাধ্যমে জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছেন। এজন্য ওনার বেলায় বলা হয়েছে- اِفْعَلُوْا مَاشِئْتُمْ (যা খুশী তা করতে পারেন) (৩) উপার্জন মানুষকে অনেক অপরাধ থেকে বিরত রাখে। চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ঝগড়া-বিবাদ, বদমায়েশী অলসতা ইত্যাদি বেকারত্বের পরিনাম (৪) উপার্জন দ্বারা মানুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং মন থেকে অহংকার বিদূরিত হয়। (৫) অভাব অনটন থেকে রক্ষা পাবার উপায় হচ্ছে উপার্জন। (৬) যে কেউ যখন উপার্জনের জন্য বের হয়, তখন আমলনামা লিখার জন্য নিয়োজিত ফিরিশতাদ্বয় বলেন, আল্লাহ তোমার এ প্রচেষ্টার মধ্যে বরকত দান করুক এবং তোমার উপার্জনকে জান্নাতের ভাণ্ডারে পরিণত করুক। এ দুআর সময় আসমান-জমিনের সমস্ত ফিরিশতা 'আমীন' বলেন। (তফসীর নঈমী ২য় পারা দ্রষ্টব্য)

নবীগণ কি কি পেশা অবলম্বন করেছিলেন?

কোন নবী ভিক্ষাবৃত্তি বা কোন নাজায়েয পেশা গ্রহণ করেননি। প্রত্যেক নবী হালাল পেশা অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রথমে কাপড় তৈরীর কাজ করেছিলেন। পরে তিনি কৃষি কর্মে নিয়োজিত হয়ে যান। তিনি জান্নাত থেকে সব রকমের বীজ নিয়ে এসেছিলেন এবং এগুলোর চাষাবাদ করতেন। তাছাড়া তিনি প্রায় পেশার কাজ করেছেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কাঠের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সেলাই কর্ম করতেন। হযরত হুদ ও ছালেহ আলাইহিস সালাম ব্যবসা করতেন, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস কৃষি কাজ করতেন, হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম গবাদি পশু পালন করতেন এবং এগুলোর দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত লুত আলাইহিস সালাম কৃষি কাজ করতেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ছাগল ছড়াতেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম লৌহ বর্ম (যুদ্ধের পোষাক) তৈরী করতেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এত বড় বাদশাহ হওয়া সত্বেও গাছের পাতার পাখা ও থলে তৈরী করে জীবন যাপন করতেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভ্রমণরত অবস্থায় ছিলেন, কোন ঘরবাড়ী তৈরী করেননি এবং বিবাহও করেননি। তিনি বলতেন, যিনি আমাকে সকালের নাস্তা দিয়েছেন, তিনি সন্ধ্যার খাবারও দিবেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের প্রারম্ভে ছাগল চড়াতেন এবং পরে হযরত খাদীজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ব্যবসা পরিচালনা করেন। মোটকথা সব রকমের হালাল উপার্জন নবীগণের সুন্নাত। একে হেয় মনে করা মূর্খতার পরিচায়ক। (তফসীর নঈমী)।

উত্তম পেশাঃ উত্তম পেশা হচ্ছে জিহাদ, এরপর ব্যবসা, অতঃপর কৃষি কাজ, এরপর কারিগরী। ওলামায়ে কিরাম বলেন, বৈধ পেশাসমূহের মধ্যে ফযীলতের দিক দিয়ে তারতম্য রয়েছে। কতেক পেশা কতেক পেশা থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আফজল। যে পেশাসমূহে দীন-দুনিয়া উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেগুলো অন্যান্য পেশাসমূহ থেকে আফজল। যেমন কারিগরী কাজের মধ্যে দীনি প্রকাশনা সবচে' উত্তম। কেননা এর দ্বারা কুরআন হাদীছ ও সমস্ত দীনি জ্ঞান ভান্ডারের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এরপর চাউল ও আটার কল, যেটা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। অতঃপর সূতা কাটা, কাপড় তৈরী ও সেলাই কর্ম সতর ঢাকার জন্য অপরিহার্য। এরপর আলোর সরঞ্জামাদি তৈরী করা। পৃথিবীতে এটারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর ইট ও সিমেন্ট তৈরী করা। এগুলোর দ্বারা শহর আবাদ করা হয়। এরপর কারুকার্য, অলংকার তৈরী, জরীর কাজ, সাজসজ্জা, আতর তৈরী করা। এগুলো একই পর্যায়ের। কেননা এগুলোর হলো সাজ-সরঞ্জাম। মোট কথা হলো, বেকার থাকা বড় অপরাধ এবং নাজায়েয পেশা অবলম্বন করা এর থেকে বড় অপরাধ। আল্লাহতাআলা হাত পা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করার জন্য দিয়েছেন, বেকার ফেলে রাখার জন্য দেননি। (তফসীর নঈমী, তফসীর আজিজি)

নাজায়েয পেশাসমূহঃ অমানবিক পেশা মকরূহ। যেমন অভাবের সময় গুদামজাত করা। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান ও কাফন পরানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করাও নাজায়েয। ওকালতী ও দালালী পেশাও নাজায়েয। অবশ্য মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে পারলে প্রয়োজনবোধে জায়েয। হারাম জিনিসের কাজ-কারবারও হারাম। যেমন গান-গাওয়া, বাদ্য বাজনা, নৃত্য ইত্যাদির পেশা। মিথ্যা সাক্ষ্যের পেশা, মদের ব্যবসা, মদ আনা নেয়া করা, নিজে ক্রয় করা বা অপরের দ্বারা ক্রয় করানো সব হারাম। অনুরূপ প্রাণীর ফটোর ব্যবসাও নাজায়েয। ফটো নিজে তোলা বা অপরের দ্বারা তোলানো সব নাজায়েয। জুয়ার কাজ-কারবার, জুয়া খেলা, জুয়ার মাল ক্রয় করা সব হারাম। সুদী কাজ কারবার করা, সুদ দেয়া, সুদ নেয়া, এর সাক্ষী হওয়া, ওকালতী করা সবই হারাম।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম মসজিদের ইমামতি ও আযানের জন্য এবং দীনি ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক নেয়াকে মকরূহ বলতেন কিন্তু পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম যখন এটা উপলব্ধি করলেন যে এ অবস্থায় মসজিদের ইমামত

ও আযান অনিয়মিত হয়ে যাবে এবং দীনি শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তাঁরা বিনা মকরূহে জায়েয বলেছেন। তাবিজের দাম নেয়াটাও বিনা মকরূহে জায়েয।

সারকথা হলো হারাম ও মকরূহ পেশাসমূহ ব্যতীত যে কোন জায়েয পেশা নিন্দনীয় নয়। যে লোক কোন জায়েয পেশাকে ঘৃণা করে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, সে দীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ। মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতার জন্য আর কত হাহুতাস করবো। ওরা সুদ গ্রহণকে হারাম জেনেছে কিন্তু সুদ দেয়াকে হালাল বুঝেছে। তাই বিনা প্রয়োজনে মামলা মোকদ্দমা ও বিবাহ শাদীর কুপ্রথাসমূহ পালন করার জন্য বিনা দ্বিধায় সুদী কর্জ নিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

স্মরণ রাখবেন, সুদ গ্রহণকারী গুনাহগার মাত্র কিন্তু সুদ প্রদানকারী গুনাহগারও এবং বোকাও। কারণ, সুদ গ্রহীতা পরকালের ক্ষতি করে দুনিয়াতে কিছুটা লাভবান হয় কিন্তু সুদ দাতা দীন-দুনিয়া উভয়ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমি হিন্দুস্থানের একটি ম্যাগাজিনে দেখেছি যে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি সুদী কর্জ টাকা অনাদায়ী রয়েছে, যেগুলোর জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। এ সুদের কারণে বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের ঘর-বাড়ী দোকানপাট, জায়গা-জমি হিন্দু মহাজনদের হাতে চলে গেছে।

আহ! মুসলমান যদি সুদ দেয়াকে সুদ খাওয়ার মত হারাম মনে করতো, তাহলে এ অবস্থার সম্মুখীন হতো না। এখনও সজাগ হলে ভবিষ্যতের অনেক অঘটন থেকে রেহাই পাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ হচ্ছে মুসাফিরের মত। যে কোন মুহূর্তে কাফিরেরা মুসলমানগণকে বিতাড়িত করতে পারে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসলমানদের অন্ধ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, বিধবা মহিলারা ও ইয়াতীম ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করে। বিভিন্ন রেল স্টেশনে ও বাড়ীতে বাড়ীতে ইয়াতীম ছেলেরা ইয়াতীমখানার নামে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুদের অন্ধ ও মাজুর ব্যক্তিরা নিজেদের উপযোগী কাজ করে জীবিকা সংগ্রহ করে। আমি অনেক অন্ধ ও বিকলাংগ হিন্দুকে ইট ভাংতে, বিড়ি তৈরী করতে ও এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করতে দেখেছি। ওদের ইয়াতীম ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্রম ও পাঠশালা রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমৃতসরে হিন্দুদের একটি আশ্রম রয়েছে, যেখানে ইয়াতীমদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। ওখানকার শিক্ষার নিয়ম হচ্ছে, সকালে দু'ঘন্টা লেখাপড়া করা এবং দু'ঘন্টা কোন একটা কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া। দুপুরের পর ওসব ছেলেরা দিয়াশলাই, আগরবাতি ও অন্যান্য ছোট ছোট জিনিস নিয়ে বাজারে চলে যায় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৭/৮ টাকা উপার্জন করে। এভাবে ওরা লেখাপড়ার সাথে সাথে কারিগরী শিক্ষায় প্রশিক্ষণ লাভ করে এবং ব্যবসা সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা লাভ করে। ফলে পরবর্তী জীবনে মুসলিম ইয়াতীমখানার ভিক্ষাকারী ছেলে ও হিন্দুদের আশ্রমের কারবারী ছেলের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ওহে মুসলমান, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করুন। মাজুর ব্যক্তি কোন কাজের নয় মনে করাটা ভুল। ওরা অনেক কাজ করতে পারে। আমি পাঞ্জাবে এক অন্ধ ব্যক্তিকে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করতে দেখেছি। আমার মতে যে মাজুর ব্যক্তি নিজে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে, সে ও ধরনের সুস্থ ও সবল ব্যক্তি থেকে অনেক আফজল, যে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের মুসলিম ইয়াতীমখানায় ইয়াতীম ছেলেদেরকে বাড়ী বাড়ী ও হাটে-বাজারে পাঠায়ে ভিক্ষা বৃত্তির যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেটা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। যদি এ ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি না করায়ে ইয়াতীমখানা চালানো সম্ভব নয়, তাহলে সে ধরনের ইয়াতীমখানা বন্ধ করে দেয়া উচিত। ইয়াতীমদের জিন্দেগী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বিবেকবান কোন ব্যক্তির উচিত নয়।

অনেক বেকার মুসলমান আভিজাত্য রোগে আক্রান্ত। অনেক জায়েয পেশাকে ওরা ঘৃণার চোখে দেখে। এসব বোকারা হালাল রুজি উপার্জনকারীদেরকে নিচু জাত এবং বেকার, সুদী কর্জ গ্রহীতা, চোর, ডাকাতদেরকে অভিজাত শ্রেণীর লোক মনে করে। আল্লাহতাআলা ওদেরকে শুভ জ্ঞান দান করুক।

যে কাপড় তৈরীর কাজ করে সে জোলা, যে জুতা তৈরীর কাজ করে সে মুচি, যে মাটির আসবাবপত্র তৈরী করে সে কুমার। মোট কথা, এ ধরনের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে ওসব

অকর্মন্যরা নিজেদের আভিজাত্যের বড়াই করে ওদেরকে ঘৃণা করে। কথায় কথায় মুচি, জোলা ইত্যাদি বলে তিরস্কার করে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে যাদের পূর্ব পুরুষের মধ্যে কেউ কোন এক সময় এসব কাজে নিয়োজিত থাকার কথা জানার পর ওদেরকে মেয়ে দেয়া হয়নি। এ জাত-বিচারের কারণে মুসলমানদের মধ্যে এসব পেশা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

মনে রাখবেন, দেশের মধ্যে আরব দেশ আফজল। ওখানে হজ্ব হয় এবং ওখানেই নবুয়াতের সূর্য উদিত হয়েছিল। বাদ বাকী দেশগুলো-ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, জাপান সব একই বরাবর। ওসব দেশের কোনখানে হজ্ব হয় না। তাই পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, ইরানী ইত্যাদি হওয়ার মধ্যে গর্বের কিছু নেই। অবশ্য আরববাসীগণ হুযুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের কাছে সম্মানিত। অনুরূপ ছৈয়দগণ আমাদের কাছে একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আমার বংশ ছাড়া সমস্ত জাত-বংশ অকেজো হয়ে যাবে। (শামী) ছৈয়দ ব্যতীত বাদ বাকী সমস্ত ইসলামী জাত-বংশ যেমন শেখ, মোগল, পাঠান ও অন্যান্যরা সমান মর্যাদার অধিকারী। ওদের মধ্যে নবী বংশের কেউ নেই। শারাফত কেবল বংশের উপর নয়, আমলসমূহের উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহতাআলা ফরমানঃ

إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র এজন্য করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। আল্লাহর কাছে সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক পরহিজগার।

যেমন পৃথিবীতে বিভিন্ন শহর ও গ্রাম আছে এবং প্রত্যেক শহরে বিভিন্ন মহল্লা আছে, যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং প্রত্যেকের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়। তেমন প্রতিটি জাতির বিভিন্ন গোত্র থাকে, যাতে মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে। কেবল জাতীয়তাকে উচ্চ বা নিম্ন মর্যাদার মাপকাঠি মনে করাটা মারাত্মক ভুল। এটা দৃঢ়ভাবে জেনে নিন যে কোন মুসলমান নিকৃষ্ট নয় এবং কোন কাফির উৎকৃষ্ট নয়। ইজ্জত সম্মান মুসলমানের প্রাপ্য। আল্লাহতাআলা ফরমানঃ

اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

ইজ্জত সম্মান আল্লাহ, রসুল এবং মুসলমানদের জন্য। পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে যার আমল অধিক ভাল, ওর ইজ্জতও অধিক। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে উৎকৃষ্ট কাজ করে এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিকৃষ্ট কাজ করে। শেখ শাদী রহমতুল্লাহে আলাইহি বলেছেনঃ

هزارخویش که بے گانہ از خدا باشد

فدائے یک تن بے گانہ کاشنا باشد

অর্থাৎ খোদাদ্রোহী হাজার আপনজন থেকে খোদা ও রসুলপ্রেমিক একজন অপরিচিত ব্যক্তি অনেক ভাল।

মোট কথা হালাল পেশাকে জিল্লতী মনে করে বেকার বসে থাকা মারাত্মক বোকামী। এখন যুগ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, বড় বড় লোকেরা কাপড় ও সুতার মিল, জুতার কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করতেছে। আর কতদিন অলসতার ঘুমে বিভোর থাকবেন? জেগে উঠুন, মুসলমান জাতির অবস্থা পরিবর্তন করুন, বেকারদেরকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করুন, ঋণগ্রস্থদেরকে ঋণ থেকে মুক্ত করুন। নিজেদের ছেলেমেয়েদের মুর্খ না বানিয়ে শিক্ষিত করে তুলুন এবং সাথে সাথে কোন একটা হাতের কাজও শিখান, যেন কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যঃ ইতোপূর্বে জানা গেছে যে, ব্যবসা অনেক নবীর পেশা ছিল। এর অগণিত ফযীলত রয়েছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে ব্যবসায়ী রিজিক প্রাপ্ত এবং প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্য গুদামজাতকারী অভিশপ্ত (ইবনে মাযা) কতেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে আল্লাহতাআলা রিযিককে দশ ভাগ করে এর নয় ভাগ ব্যবসায়ীকে দিয়েছেন এবং এক ভাগ সমস্ত দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন। আরও বর্ণিত আছে যে-কিয়ামতের দিন সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী

নবীগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে। ব্যবসায়ী মূলতঃ রাজমুকুটধারী। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় থাকে। ব্যবসার দ্বারা বাজার সমূহের সৌন্দর্য, দেশের প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং মানুষের জীবনযাত্রা অটল থাকে। জীবন মরণ সব সময়ে ব্যবসার প্রয়োজন। মুর্দারের কাফন-দাফনের সামগ্রী ব্যবসায়ীদের থেকেইতো ক্রয় করা হয়। যেকোন দেশের সরকারের রাজত্ব মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে।

মসজিদ তৈরীর জন্য ইট-সিমেন্ট এবং মসজিদের অন্যান্য আসবাবপত্র সব ব্যবসায়ীদের থেকে আনা হয়। কাবা শরীফের গিলাফও ব্যবসায়ীদের থেকে ক্রয় করা হয়। সতর ঢাকার জন্য কাপড় এবং রোযা ইফতারের জন্য ইফতারীও দোকানদার থেকে ক্রয় করা হয়। কুরআন-হাদীছ ছাপানোর জন্য কাগজ কালিও ব্যবসায়ী থেকেই আনতে হয়। মোট কথা ব্যবসা দীন দুনিয়া উভয়টার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আফসোস, হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা ব্যবসার প্রতি উদাসীন। বর্তমান হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা পনের কোটি। যদি গড়ে এক টাকাও খরচ করে, তাহলে প্রতিদিন পনের কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ পনের কোটি টাকা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়। এ হিসেবে মাসে ৪৫০ কোটি এবং বছরে ৫৪০০ কোটি টাকা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়।

আহ! যদি এর অর্ধেক টাকাও যদি মুসলমানদের হাতে রয়ে যেত, তাহলে আমাদের মুসলিম জাতির অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়ে যেত। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দূরে থাকার কারণে আমরা ব্যবসার যাবতীয় আয়-বরকত থেকে বঞ্চিত। কাল বিলম্ব না করে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝাপিয়ে পড়ুন এবং আস্তে আস্তে বড় বড় বাজারগুলো হস্তগত করুন এবং এসব ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত লোক গড়ে তুলুন। কেননা সৎ ও বিশ্বস্থ লোকের খুবই অভাব। প্রত্যেকে নিজ স্বার্থ হাসিল করতে চায়।

কাহিনীঃ একবার সুলতান মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব খুব লম্বা মুনাজাত করলেন। এক দরবেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি কি গাধা কামনা করছেন? রাজ সিংহাসনে বসে আছেন, তাজ পরিধান করে রাজ্য শাসন করছেন। এরপরও এত দীর্ঘ মুনাজাত করার কি প্রয়োজন আছে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাধা নয়, মানুষ কামনা করছি। আল্লাহতাআলা যেন সৎ পরামর্শদাতা দান করেন। কেননা উপযুক্ত পরামর্শদাতার পরামর্শে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

কাহিনীঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সভাসদের কোন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটার কি কারণ যে আগের তিন খলীফার যুগে ইসলামের অনেক বিজয় হয়েছে কিন্তু আপনার খেলাফতকালে কেবল গৃহযুদ্ধই লেগে রইলো। তিনি সাথে সাথে জবাব দিলেন, এর একমাত্র কারণ হলো ওনাদের উজীর ও পরামর্শদাতা ছিলাম আমি আর এখন আমার পরামর্শদাতা হলেন আপনারা। তাই যেমন উজীর তেমন বাদশা।

এমনিতে প্রত্যেক মুসলমানকে সদালাপী হওয়া আবশ্যক। তবে ব্যবসায়ীর সদালাপী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মুসলমান ব্যবসায়ীদের অকৃতকার্যের মূলে দুর্ব্যবহারও একটি অন্যতম কারণ। যে গ্রাহক ওনাদের কাছে একবার এসেছে, সে গ্রাহক ওনাদের দুর্ব্যবহারের জন্য দ্বিতীয়বার আর আসে না। আমি হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে দেখেছি যে যখন ওরা কোন মহল্লায় নতুন দোকান খোলে, তখন ওরা ছোট ছেলেদেরকে, যারা জিনিস কিনতে আসে, চকলেট, বেলুন, বাঁশি ইত্যাদি দেয়। যেন ওরা এর লোভে বার বার আসে। বড় বড় হিন্দু ব্যবসায়ীরা বিশিষ্ট গ্রাহকদেরকে পান বিড়ি সিগারেট, চা-নাস্তা এমনকি মাঝে মধ্যে খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করে থাকে। এসবের একমাত্র কারণ হলো গ্রাহক আকর্ষণ। আপনি যদি এসব কিছু করতে না চান, কমপক্ষে গ্রাহকের সাথে মিষ্ট ব্যবহার করুন। যেন সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ব্যবসায়ীকে চরিত্রবান ও সৎ হওয়া প্রয়োজন। চরিত্রহীন বদমাইশ ও হারামখোর কখনো ব্যবসায় সফলকাম হতে পারে না। সেতো আকাম-কুকামে লিপ্ত থাকে ব্যবসা কখন করে। বিধর্মীরা খুবই বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করে। বিশ্বস্ততার কারণে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাকীতে মালপত্র দেয়। গ্রাহকেরাও ওর প্রতি আস্থাশীল হয়। আজকালকার ব্যাংক, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ বিশ্বস্ততার উপরই পরিচালিত হয়। ঠকবাজ, ভেজালকারী, মিথ্যাবাদী সাময়িকভাবে বাহ্যতঃ মুনাফা করলেও শেষ পর্যন্ত মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়।

পৃথিবীর কোন কাজ পরিশ্রম ছাড়া হয় না। ব্যবসার ব্যাপারেও কঠোর পরিশ্রম, মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন। অলস ব্যক্তি কোন সময় কোন কাজে সফলকাম হতে পারে না। কথায় বলে, শ্রম ছাড়া গ্রাসও মুখে উঠে না। ব্যবসায়ী যত বড় হোক না কেন, সব কাজ কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিত নয়। কিছু কাজ নিজ হাতে রাখা প্রয়োজন।

ব্যবসার মূলনীতিঃ ব্যবসার কয়েকটি মূল নীতি আছে, যেগুলোর অনুসরণ ব্যবসায়ীদের জন্য অপরিহার্য। শুরুতেই বড় আকারের ব্যবসা শুরু করা উচিত নয়। প্রথমে ছোটখাট কিছু একটা করা দরকার। ইতোপূর্বে একটি হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে লাকড়ী কেটে বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কাহিনীঃ এক ব্যক্তি ব্যবসা করার জন্য আগ্রহী হলো। সে কোন একটি নাম করা ফার্মের মালিকের কাছে পরামর্শের জন্য গেল। ধারণা ছিল যে ব্যবসার মধ্যে কোন একটা গোপন ভেদ আছে, সেটা জানতে পারলে এক লাফে লাখপতি হয়ে যাবে। ফার্মের মালিক ওকে পরামর্শ দিলেন যে তুমি প্রথমে এক ডজন দিয়াশলাই নিয়ে বাজারে চলে যাও। সন্ধ্যার মধ্যে সেটা বিক্রি করে এক টাকাও যদি লাভ করতে পার, তাহলে তুমি কৃতকার্য। এরপর তোমার বিক্রি আরও একটু বৃদ্ধি পেলে, এর সাথে সিগারেটের প্যাকেটও রাখতে শুরু কর। আরও একটু অগ্রসর হলে পানও রাখতে পার। এভাবে তুমি ক্রমান্নয়ে একদিন বড় ব্যবসায়ী হয়ে যেতে পারবে। দেখুন, হিন্দুদের ছেলেরা প্রথমে বড় ব্যবসা শুরু করে না, বরং মামুলী ব্যবসা করে একদিন লাখপতি হয়ে যায়। আমি কাটিয়া ওয়ার্ডের মেমন ব্যবসায়ীদেরকে দেখেছি যে যখন ওনারা কাউকে ব্যবসা শিখান, প্রথমে ওকে একবছর বাবুর্চী কাজে নিয়োজিত রাখেন। পরবর্তী বছর বাকী আদায়ের কাজে নিয়োজিত করেন । তৃতীয় বছর বিল ছাড় করানো ও মাল বুক করার দায়িত্ব দেন, চতুর্থ বছর খুচরা বিক্রেতা হিসেবে দোকানে বসান। অতঃপর দোকানের চাবিসমূহ বুঝায়ে দেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় পছন্দ ও মানানসই ব্যবসা করা উচিত। আল্লাহতাআলা এক একজনকে এক এক কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কেউ খাদ্যশস্য, কেউ কাপড়, কেউ কাঠ, কেউ বই-পুস্তকের ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে। তাই ব্যবসা শুরু করার আগে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর স্থির করতে হবে যে, কোন্ ধরনের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করা যাবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, প্রথম থেকেই আমি শিক্ষা দীক্ষার সাথে জড়িত ছিলাম। কিন্তু ব্যবসার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল। তাই আমি খাদ্যশস্যের নানা ব্যবসা করেছি। কিন্তু কোন সময় লাভবান হতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত এখন আমি কিতাবের ব্যবসা শুরু করেছি। খোদার ফজলে, এতে আমি যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। আমি বুঝতে পারলাম যে শিক্ষাদীক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য বই-পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবসাই উপযোগী। আমি এমন অনেক হিন্দু মাস্টারকে দেখেছি যে যারা শিক্ষকতার সাথে সাথে বই-পুস্তক, কালি-কলম, কাগজ ইত্যাদিও স্কুলে বিক্রি করে থাকে। এর মুনাফা দ্বারা ওদের মাসিক হাত খরচ হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ বেতনটা জমা থাকে। তাই ব্যবসা নির্বাচনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অজানা কোন কাজে হাত দেয়া উচিত নয় এবং সব কিছুর ব্যাপারে অন্যদের উপর নির্ভর করা মোটেই ঠিক নয়।

হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা একেতঃ ব্যবসা খুবই কম করে এবং করলেও মূলনীতিতে ভুলের কারণে অতি সহসা লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়।

মুসলমান দোকানদারেরা সাধারণতঃ বদমেজাজী হয়ে থাকে। ফলে যে গ্রাহক ওদের কাছে একবার আসে, সে দ্বিতীয়বার আর আসে না।

তারা দোকান খুলতেই লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। যদি দু'একদিন বেচাকেনা ভাল না হয় বা কোন একটাতে কিছু ক্ষতি হলে সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ করে দোকান ছেড়ে দেয়। এর ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ রয়েছে।

অধিকাংশ মুসলিম ব্যবসায়ী সহসা লাখপতি হওয়ার জন্য অধিক মুনাফায় ব্যবসা করে। একই জিনিস যদি আশেপাশে কম দামে বিক্রি হয়, তাহলে ওদের

কাছে কোন্ পাগল যাবে? নিত্য প্রয়োজনীয় ও সহজলভ্য মালে কম মুনাফা করা উচিত। তবে দুষ্পাপ্য জিনিসের জন্য অধিক মুনাফা নিলে কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম ব্যবসায়ী অনেক সময় আয় থেকে ব্যয় বেশী করে। ফলে অতি সহসা দেউলিয়া হয়ে যায়।

হিন্দুরা মুসলমান ব্যবসায়ীকে মোটেই পছন্দ করে না। ওরা সহজে কোন মুসলমানের দোকানে আসে না। অনেকবার দেখা গেছে যে, কোন মুসলমান কোন জায়গায় দোকান খুললে আশেপাশের হিন্দু দোকানদাররা জিনিসপত্রের দাম সস্তা করে দেয়। মুসলমান গ্রাহকরা সামান্য সস্তার জন্য ওদের দিকে ঝাপিয়ে পড়ে। এটা চিন্তা করে দেখে না যে হিন্দুদের পয়সা কোন মুসলমানের কাজে লাগে না। কিন্তু কোন মুসলমান ব্যবসায়ী যৎসামান্য বেশী নিলেও সেটা আমাদের ঘরে আসে। আমি উপকৃত না হলেও অন্য মুসলমান হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু স্বজাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার। এ ধরনের মনোভাব দ্বারা জাতীয় শক্তি সৃষ্টি হয়।

কাহিনীঃ এক ব্যবসায়ী থেকে শুনেছি যে এক ইংরাজ ওনার দোকানে ছুরি ক্রয় করতে আসে। তিনি একটি খুব ভাল জাপানী ছুরি দেখালেন, যার মূল্য ছিল মাত্র পচাত্তর পয়সা। সে ছুরিটা দেখে খুবই পছন্দ করলো এবং দারুণ খুশী হলো। কিন্তু জাপানী সীল দেখার সাথে সাথে ঘৃণাভরে রেখে দিল এবং বললো, জাপানী ছুরি ভাল নয়। কোন ইংলিশ ছুরি থাকলে দেখাও। আমি ওকে লন্ডনের তৈরী একটি মামুলী ছুরি দেখালাম, যার মূল্য ছিল তিন টাকা। সে সানন্দে সেটা নিল। একেই বলে স্বজাতীয় মনোভাব। জাপানী মাল সুন্দর ও সস্তা হওয়ার পরও নিল না, লন্ডনের মামুলী জিনিসকে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করলো। মুসলমান গ্রাহকগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

ব্যবসায়ীদের এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে অধিক মুনাফার আশায় মাল আটকে রাখা মারাত্মক ভুল। অনেক সময় দাম বৃদ্ধির পরিবর্তে সস্তা হয়ে যায়। বাৎসরিক একবার অধিক মুনাফার চেয়ে দৈনিক সামান্য মুনাফা অনেক উত্তম।

ব্যবসার আরও অনেক মূলনীতি রয়েছে, যা ব্যবসার জগতে প্রবেশ করলে অনায়াসে জানা হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় মুসলমানগণ, হালাল রিজিক অর্জন করুন। বেকারত্ব অনেক অনেক পাপের উৎস। হালাল রিজিক দ্বারা ইবাদতের আগ্রহ, নেক কাজের উৎসাহ এবং আনুগত্যের জজ্বা সৃষ্টি হয়। যে ঘরে বখাটে ছেলে ও বেকার যুবক থাকে, সে ঘর অশান্তির মূল। মসনবী শরীফে বর্ণিত আছেঃ

علم وحکمت زائد از لقمه خلال+عشق ورقت زائد از لقمه خلال

لقمه تخم است دهر ش اند یشها+ لقمه بحر وگوهرشاندیشها!

زائد از لقمه حلال اندر دهان+ میل خدمت عزم سوتے ان جهان

چون زلقمه تو حسد بینی دوام+ جهل وغفلت زائد آن رادان حرام

অর্থাৎ হালাল লোক্‌মা ইল্‌ম ও হিকমতের উৎপাদক। হালাম লোক্‌মা দ্বারা ইশ্‌ক ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি সৎ গুণের মুল হলো হালাল উপার্জন। যে লোক্‌মা দ্বারা হিংসা অজ্ঞতা ও অলসতা সৃষ্টি হয়, সেটা নিশ্চয় হারাম লোকমার প্রভাব।

হে খোদা, অধমের উপরোক্ত আলোচনায় তাছীর দান করুন, মুসলিম জাতিকে বেকারত্ব থেকে রক্ষা করুন এবং আমাকে সেই দিন দেখান, যখন আমাদের প্রতিটি মুসলমান ভাইকে দীনদার, স্বচ্ছল ও একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল পাব। আমীন

اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ

سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ٥

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২।	জা'আল হক (২)	"
৩।	সালতানতে মুস্তাফা	"
৪।	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫।	দরসুল কুরআন	"
৬।	ইলমুল কুরআন	"
৭।	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৮।	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
৯।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১০।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১১।	মাতা-পিতার হক	"
১২।	তাজিমী সিজদা	"
১৩।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৪।	বাহারে শরীয়ত	মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৫।	কানুনে শরীয়ত	মুফ্‌তি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৬।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৭।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৮।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৯।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
২০।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২২।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৩।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফ্‌তি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৪।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৫।	হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
২৬।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
২৭।	মুমিন কে?	আল্লামা তাহেরুল কাদেরী
২৮।	গাউছুল আযম	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪, মোবাইল ঃ

ইসলামী জিন্দেগী

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরাতুল আল্লামা
মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।